ইনসাইড 'র'

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়

মূল : অশোকা রায়না

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আবু রুশ্‌দ

Bangladesh DEFENCE Journal Publishing

বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল পাবলিশিং

ইনসাইড ‘র’

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

মূল : অশোকা রায়না
অনুবাদ ও সম্পাদনা : আবু রূশ্‌দ

Bangladesh DEFENCE Journal

বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল পাবলিশিং

প্রকাশক	:	এ. আর. মো. শহিদুল ইসলাম - আবু রূশ্‌দ বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল পাবলিশিং
গ্রন্থস্বত্ব	:	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম সংস্করণ	:	৭ নভেম্বর ১৯৯৩
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
তৃতীয় সংস্করণ		১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
চতুর্থ সংস্করণ	:	১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রচ্ছদ	:	এম. হামিদুল হক মানিক
ISBN		978-984-90730-1-7
কম্পিউটার কম্পোজ	:	বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল পাবলিশিং বাড়ি # ২৭, রোড # ১১, ব্লক # এফ বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
মূল্য	:	৩০০.০০ টাকা

Inside RAW - The Story Of India's
Secret Service, By Asoka Raina
Bengali Version by
Abu Rushd

উৎসর্গ

আমার নানী মরহুমা আসিয়া খানম
যিনি আমাকে লালন-পালন করেছেন,
আমৃত্যু সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়িয়েছেন,
তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে-

চতুর্থ সংস্করণের কথা

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেরই গুপ্তচরসংস্থা থাকে। কিন্তু এর খুব কমই আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিচরণের ক্ষমতা রাখে। আবার তার মধ্যে হাতে গোনা ক'টি সংস্থা সফলতার সাথে অপারেশন পরিচালনার রেকর্ড গড়তে পারে। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা- 'র' এমনি একটি প্রতিষ্ঠান। আবার সব সাফল্যের মাঝে তাদের সবচেয়ে বড় 'অর্জন' হচ্ছে ১৯৭১ সালে পরিচালিত 'অপারেশন বাংলাদেশ'।

গুপ্তচর সংস্থা নিয়ে পৃথিবীতে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। এর সবগুলোই পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় হিসেবে আদৃত। কারণ গুপ্তচর বৃত্তির রহস্য ও অজানা কথা জানার আগ্রহ সকলেরই রয়েছে। ভারতীয় সাংবাদিক অশোকা রায়নার লেখা 'ইনসাইড রঃ ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়' এমনি একটি আকর্ষণীয় বই। 'র' এর ইতিহাস ও কর্ম তৎপরতা নিয়ে এই বইটিই প্রথম প্রকাশিত দলিল।

আমি বইটি প্রথম অনুবাদ করি ১৯৯৩ সালে। এর মাঝে এর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তবে দীর্ঘ দিন যাবত বইটির নতুন কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। ভারতের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা ভিকাস পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড ইংরেজিতে বইটি প্রথম প্রকাশ করে ১৯৮১ সালে। এটিই 'র' নিয়ে লিখিত প্রথম বই যাতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এর ভূমিকা ছাড়াও সিকিমের ভারতভুক্তকরণ সম্পর্কিত প্রামানিক দলিল উপস্থাপন করা হয়। সাংবাদিকতায় যোগ দেয়ার পর আমি ভিকাস পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অনুমোদন নিয়ে বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করি। চলতি সংস্করণে ভাষাগত বেশ কিছু সম্পাদনা করা হয়েছে। এছাড়া 'র'-এর নতুন সাংগঠনিক ছক, গুপ্তচরবৃত্তির বৃত্তসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে ওই সংস্থার পরিচালিত তৎপরতার দলিল হিসেবে।

আশা করি গুপ্তচরবৃত্তির রহস্যময়তায় অনুরক্ত পাঠক ছাড়াও ইতিহাস সচেতন পাঠকের কাছে বইটি আদৃত হবে।

আল্লাহ হাফেজ।

আবু রূশ্‌দ　　　　ঢাকা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[ভারতের ভিকাস পাবলিশিং হাউজ প্রা. লি. থেকে বাংলাদেশের জন্য অনুবাদককে স্বত্ব প্রদানের চিঠি]

VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT LTD

576 Masjid Road, Jangpura, New Delhi - 110 014
Phones: 4624605, 615313, 4624902 Cable: VIKASBOOKS, New Delhi
Telex: 31-65106 UBS IN Fax No : 91-11-327-6593

24 September 1993

Mr ARM Shahidul Islam
~~c/o Mr Abul Kashem~~
Sec-2, Block-A Road No.2
Plot No.12
Mirpur
Dhaka 1216
BANGLADESH

Dear Mr Shahidul Islam:

Thank you for your letter dated 12 September 1993 enclosing a draft for $ 32 in account of publishing the Bengal edition of our book, INSIDE RAW.

This is to confirm that you may go ahead in publishing the translated edition as requested.

We would welcome your desire to publish any other book ~~printed~~ by us.

With kind regards,

Yours sincerely,

C.M.CHAWLA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

অনুবাদকের অনুস্মৃতি

'গুপ্তচর' ও 'গুপ্তচরবৃত্তি' নিয়ে আগ্রহ কম-বেশি সবারই আছে। বিখ্যাত 'জেমস্ বন্ড' বা 'মাসুদ রানা'র ভক্ত এ দেশে বোধকরি কম নয়। (আমাদের দেশের প্রখ্যাত লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক যিনি তাঁর রচনায় গুপ্তচরবৃত্তি ও এসপায়োনজ নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি করেছেন)। ক্লান্তিময় একঘেয়ে জীবনে ক্ষণিকের জন্য কল্পজগতে ভেসে বেড়ানোর মধ্যে আছে এক ধরণের আলাদা রোমাঞ্চ। তবে বাস্তবতার নিরিখে বলতে হয়, এ সবই হচ্ছে 'Spy Fiction' বা 'Spy Thriller' কিন্তু 'Real World of Spies' নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্টেলিজেন্স জগত একটি রূঢ়, নিরামিষ, নিরানন্দময় কর্মক্ষেত্র হিসেবে গুপ্তরচরবৃত্তিতে নিয়োজিত পেশার লোকদের কাছে পরিচিত। সুপ্রিয় পাঠক, এতে অবশ্য আপনারা যারা ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী তাদের অজানা জগত আবিষ্কারের মজা মোটেই ক্ষুণ্ন হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই বরং নিষিদ্ধ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার মোহাচ্ছন্নতা আছে পুরোপুরি।

আধুনিক গুপ্তচরবৃত্তি অত্যন্ত ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হয়। এর প্রকৃত ধরণ ঘটনা সংঘটনের সময় বোঝা বা জানা না গেলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা আলোর মুখ দেখে। এ বইটির ক্ষেত্রেও এ কথাটি সর্বাংশে প্রযোজ্য। আজ থেকে ২০ বছর আগে সিকিম নিয়ে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার গৃহীত পদক্ষেপ ভারত অস্বীকার করলেও এখন নিজেরাই তা প্রকাশ করছে। আসলে ইন্টেলিজেন্সে 'আজ যা মিথ্যে-কাল তা সত্য' কিন্তু ততোদিনে 'Operation is over'.

আমি অশোকা রায়নার লেখা "Inside RAW-The Story of India's Sccrct Service" বইটি প্রথম পড়ি ১৯৮৫ সালে। তখন বইটি আমার অনুসন্ধিৎসু মনকে দারুণভাবে আলোড়িত করলেও সামরিক বাহিনীতে কর্মরত থাকায় অনুবাদ কাজে অগ্রসর হতে পারিনি। পরবর্তীতে যখন হঠাৎ করে স্বাস্থ্যগত কারণে অবসর গ্রহণ করি তখন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রংপুর শাখা ছাত্রমৈত্রীর প্রাক্তন নেতা কাজী মাজিরুল ইসলাম লিটন আমাকে বইটি অনুবাদ করার জন্য বারবার তাগিদ দিয়ে এক প্রকার অতিষ্ঠ (!) করে তোলে। এরপর ঢাকায় চলে আসার পর 'দৈনিক সমাচারের' সিনিয়র রিপোর্টার অগ্রজপ্রতিম খন্দকার গোলাম আজাদ বইটির তথ্যগত গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাকে 'কোমর বেঁধে' অনুবাদকর্ম শেষ করার জন্য অনুরোধ করেন। বলতে গেলে ওনার ব্যক্তিগত উৎসাহে অসুস্থ শরীর নিয়েও আমি আরাধ্য কাজ শেষ করতে বাধ্য হই। এদিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিন্তিত ছিলাম যে, এরূপ একটি স্পর্শকাতর বই-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় প্রকাশনা সংস্থা 'Vikas Publishing House' অনুবাদের অনুমতি প্রদান করবে কিনা? কারণ বইটিতে প্রকাশিত অনেক তথ্য ও ঘটনা ভারতীয় বিশেষ করে

'র'-এর স্বার্থের কিছুটা হলেও পরিপন্থী। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে উক্ত প্রকাশনী সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম সি চাওলা মাত্র এক মাসের মধ্যে অনূদিত বাংলা সংস্করণ প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন, যা আমার কাছে ভারতের দীর্ঘদিনের গণতন্ত্র চর্চা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। এরপর আর বাধা কোথায়? প্রকাশক খোঁজার (!) কষ্টটুকু আমাকে করতে হয়নি, কারণ আমার ক্যাডেট কলেজের সহপাঠী বিশিষ্ট প্রকাশনী সংস্থা 'মিলারস প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী তারিক হাসান তো গত ক'মাস হলো একপায়ে খাড়া হয়েই ছিল। তাই দিনক্ষণ ঠিক করে মাঠে নেমে পড়তে ওর একটুও দেরি হয়নি।

আমাদের দেশে 'র' সম্পর্কিত প্রচুর লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে এবং এ ধরণের সব লেখাতেই 'র'-এর বিভিন্ন কার্যক্রম বা সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়ে থাকে যা সত্য হলেও অনেকে তাঁদের নিজস্ব মতাদর্শগত কারণে সত্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন। আমার এ বইটি অনুবাদ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, উক্ত মতাদর্শীদের কাছে ভারতীয় লেখকের স্বীকারোক্তি পৌঁছে দেয়া, যেন তাঁরা কোনো অজুহাতে বলতে না পারেন যে, এ সব বাংলাদেশী লেখকের লেখা 'ডাহা মিথ্যে' বা 'স্রেফ গালগপ্পো'।

যেহেতু, মূল বইটি ভারতীয় লেখকের লেখা তাই তথ্যগত সত্যাসত্য প্রমাণের দায়দায়িত্ব লেখকের কাছেই রয়ে গেছে, এখানে আমার নিজস্ব কোন মতামত প্রতিফলিত হয়নি ও সে সুযোগও আমার ছিল না।

শেষে আপনাদের কাছে আমার একটু প্রয়োজনীয় সাফাই (!) গাইবার আছে আর তা হ'লো আমি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নই (যদিও কোনো একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আমি আকৃষ্ট এবং ভোটের সময় সে দলের প্রতীকেই 'সিল ছাপ্পর' মেরে থাকি) এবং কারো পুন্যস্মৃতি তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হোক বা শহীদ জিয়ারই হোক সেখানে আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি এ বইটি অনুবাদ করিনি এবং এটা সকল মতাদর্শের সচেতন পাঠকের জন্য অনূদিত হয়েছে।

সুতরাং আসুন, একবার অন্তত গুপ্তচরবৃত্তির চোরাগলিতে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

আবু রুশদ

২৩ কার্তিক ১৪০০ বাংলা
৭ নভেম্বর ১৯৯৩ ইংরেজী
ঢাকা।

মুখবন্ধ

-লেখকের কথকতা

পৃথিবীর অন্য কোনো সংস্থা, ভারতের মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের অধীন বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থা 'রিসার্চ এন্ড এ্যানালিসিস উইং' অর্থাৎ 'র'-এর মতো মাত্র বার বছর সময়কালের মধ্যে এতো শোরগোল ও সমালোচনার ঝড় তুলতে পারেনি।

জনগণের নিকট সিনেমা, বইপত্র, পত্র-পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে বন্যার ন্যায় ক্রমাগত প্রবহমান 'বিকৃত তথ্যের উপস্থাপনা' (ইন্টেলিজেন্স জগতের অর্থহীন অপভাষা প্রয়োগে) তাদের মনে একটি বিকৃত চিত্রের প্রতিস্থাপন ঘটায়। প্রকৃত সত্যের পরিবর্তে অজ্ঞানতার বিভিন্ন স্তর সাধারণ জনগণের নিকট উপস্থাপন করা হয়। সাধারণের মনে এ ধারণা জন্মে যে, 'র'-এর ঝুলিতে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার সঞ্চয়ই বেশি। যে কোনো সরকার এমনকি আমাদের সরকারও 'সাফল্যের তুলনায় অধিক ব্যর্থতার বোঝা' বহনকারী এমন কোনো 'প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ' সংস্থাকে দীর্ঘদিন পুষতে পারেন না। 'র'-এ কর্মরত ব্যক্তিবর্গ যারা 'গুপ্তচর' হিসেবে পরিচিত, তারা প্রতিবাদের কোনো বিশেষ সুযোগ না থাকায় মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে বাধ্য হন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কোথাও যখন 'র' বিরোধী প্রচারণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন সরকার পর্যন্ত অনুরূপ 'চুপচাপ' থাকার নীতি অবলম্বন করেন। তবে প্রথমবারের মতো ১৯৮০ সালের ৯ই জুলাই নয়াদিল্লিতে সি আই ডি-র (Criminal Investigation Department) সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ববর্তী সরকারের (জনতা সরকার-মোরারজী দেশাই) আমলে 'র'-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং উল্লেখ করেন, সংসদে ও বাইরে একটি ভুল ধারণার জন্ম হয়েছে যে, এ সংস্থা ('র') দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ধরণের গুজব সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

গুপ্তচরবৃত্তি সংক্রান্ত কোনো বই লেখার জন্য বিভিন্ন উৎস বা সূত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ বিষয়টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে দালিলিক তথ্য প্রমাণ গ্রন্থকারের নিকট হয়তো খুবই অল্পমাত্রায় অথবা একেবারেই সহজলভ্য হয় না। তবে স্পর্শকাতর সংবাদ প্রতিবেদন ও জনসমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'র'-এ কর্মরত ও পূর্বে কাজ করেছেন এমন অনেকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তান্বিত ছিলেন এবং তাদের কর্মকালের অনেক বিবরণ প্রকাশ করতে আগ্রহান্বিত হন। এর ফলে আমি তাদের অনেককে 'কথা বলার' মতো পরিস্থিতিতে পেয়ে যাই। এখানে আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই যে, 'র'-এর কর্মরত কোনো ব্যক্তি আমার এ বইটির কোনো তথ্যে বা ঘটনার সরাসরি অনুমোদন দেননি বা তাদের কেউ পরোক্ষভাবে বা ইঙ্গিতেও বইটি লেখায় উদ্বুদ্ধ করেননি। আসলে আমি যখন 'র'-এর সাবেক প্রধান আর এন কাও-এর সাথে যোগাযোগ করি তখন তিনি আমাকে

বলেছিলেন, "এ বইটি কখনো লেখা উচিৎ নয়।" অবশ্য ততোদিনে বইটির প্রথম খসড়া তৈরি শেষে তা প্রকাশকের কাছে পাঠানো হয়ে গেছে। কাও গুপ্তচর জগতের প্রাচীন প্রবাদ "যার যতোটুকু জানা প্রয়োজন তার শুধু ওটুকুই জানা দরকার"–এ নীতিবাক্যের উল্লেখ করে আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন।

বইটি লেখার প্রথম দিকে আমার বেশকিছু বন্ধু-বান্ধব আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কীভাবে 'র' সম্পর্কে লিখতে পারি যেখানে আমি কখনো ওই সংস্থায় কর্মরত ছিলাম না? যারা এভাবে চিন্তা করতেন, তাদের কাছে আমার শুধু একটি কথাই বলার আছে। একজন সাংবাদিক যিনি যে কোনো বিষয়ের 'তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদক' হোন না কেন, তাকে কোনো বিষয়ে প্রতিবেদন লিখতে হলে তার ওই রূপ পরিস্থিতি বা পরিবেশে অবস্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় নয়। যাহোক, আমাকে প্রচুর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও পড়াশোনা করতে হয়েছে।

আমি মনে করি, এ বইয়ে যে সব তথ্য ও ঘটনাই সন্নিবেশিত থাকুক না কেন তা ইতোমধ্যে 'অন্যপক্ষের' জানা হয়ে গেছে। পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স, চীনা ইন্টেলিজেন্স, মার্কিন সি আই এ, বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস (এস আই এস) বা রাশিয়ান কে জি বি ও অন্যান্য দেশের ইন্টেলিজেন্স সংস্থা এ বইয়ে উল্লিখিত ঘটনাপঞ্জি ভালোভাবেই জানে এবং বর্ণিত এসব ঘটনা এরমধ্যে ঘটেও গেছে। সুতরাং ভারতীয় জনগণের এ সব 'ব্যাপার স্যাপার' জানায় কোনো বাধা থাকা উচিত নয় বরং এর যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণও নেই।

এখানে যা বিধৃত হয়েছে তা আমার তিন বছরাধিককালের পরিশ্রমের ফসল। অবশ্য এরমধ্যে খণ্ড খণ্ডভাবে পত্র-পত্রিকায় ছিটেফোঁটা কিছু লিখেছি। অনুমতিসাপেক্ষে কারো দেয়া তথ্য ছাড়া যাদের নাম লেখনীর ধারাবাহিকতায় সংযোজিত হয়েছে তারা কোনো উপায়েই আমাকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করেননি। ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণে অতীতে 'র'-এ কর্মরত ও বর্তমানে কর্মরত কেউ কেউ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের নাম তদীয় ইচ্ছানুসারে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। আমি তাদের প্রতি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের বছরের পর বছর অসচেতনভাবে বর্ণিত ঘটনাপঞ্জির সাহায্য ছাড়া, কল্পিত ঘটনা ও বাস্তবের মধ্যে সীমারেখা টেনে 'র' সম্পর্কিত পরিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন সম্ভব ছিল না। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'র'-এর কার্যক্রম নিয়ে এটি একটি পরিপূর্ণ বই ও সম্ভবত এখানে উল্লিখিত ঘটনাসমূহের বর্ণনার বাইরে এ সংক্রান্ত নতুন কিছু যোগ করার নেই এবং তা করলেও সত্যের অপলাপ হবে মাত্র। তবে আমি দাবি করছি না যে, এ সবই সর্বাংশে সত্য ও নিখুঁত। যখন আমি বিভিন্ন অপারেশনের বর্ণনা দিয়েছি তখন অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা বর্ণনায় ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের নাম পরিবর্তন করেছি মাত্র। কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখ করায় অনেকেই আমার শত্রুতে পরিণত হতে পারেন বলে কাউকে ব্যক্তিগত আঘাত দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধুমাত্র 'র'-এর প্রয়োজনের দিকটিই ভেবেছি।

এ বইয়ে বর্ণিত বিষয়াবলী আমার নিজস্ব সংগ্রহ, 'বেনামি' ব্যক্তিবর্গের গৃহীত সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সাময়িকী ও বইপুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। আমি স্বনামে ও বেনামে উল্লিখিত সবার নিকট ও প্রকাশকের কাছে তাদের সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

অনেকেই সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহে সহৃদয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বিশেষ করে মিসেস ইন্দিরা লাউল যিনি পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দিয়েছেন ও আমার পিতা লে. কর্ণেল বি এল রায়না যিনি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে আমার স্ত্রী নীরা, যে এ বিষয়টিকে পুরোপুরি 'সতীনের' মতো মনে করেও যথেষ্ট শ্রম দিয়েছে ও দু'পুত্র রজত ও রাজীব যারা হৈ-হট্টগোল না করে আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটায়নি (!) তাদের কথাও এখানে স্মরণ করতে হয়। যখন বইয়ের সব কাজ শেষ হলো তখন দশ বছর বয়সী রাজবী তার এক বন্ধুকে ব্যাখ্যা করে বলছিল যে, "আমার আব্বা, 'র'-নিয়ে একটি বই লিখেছে। এটা গুপ্তচরদের গল্প নিয়ে লেখা, যা বড়রা বুঝতে পারে না, উনি তাদের বোঝাতে চাচ্ছেন, আসলে ব্যাপারটা কি।" আমি মনে করি না এর চেয়ে ভালোভাবে অন্যকিছু বলার আর প্রয়োজন আছে।

নয়া দিল্লি
অশোকা রায়না

সূচিপত্র

গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান	১২
যাত্রা হলো শুরু	১৭
'র'-এর গঠন প্রক্রিয়া	২৩
গুপ্তচরবৃত্তির কলাকৌশল	২৮
রাখঢাক ছদ্মাবরণ	৫৬
অপারেশন বাংলাদেশ	৬১
অপারেশন সিকিম	৭৮
পারমাণবিক অনুমোদন	৮৮
'র'-এর ভাগবাটোয়ারা	৯৩
বৈদেশিক নীতিমালা	১০৩
গুপ্তচরবৃত্তি কি আদৌ প্রয়োজনীয়?	১০৮
ছক ও ছবি	১২৪

অধ্যায় : ১

গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান
The Institute of Spies

'আমি গুপ্তচর,' 'তুমি গুপ্তচর'-এ ধরণের লুকোচুরি খেলা বহুদিন যাবত পৃথিবী জুড়ে চলছে। 'পাতলা বা অকিঞ্চিৎকর' আবরণে সত্য পরিচয় ঢেকে রেখে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো ইন্টেলিজেন্স জগতে বহুল আলোচিত একটি পদ্ধতি, যদিও এ 'ঢেকে রাখা' স্বীকৃত নৈতিকতার মানদণ্ডে বড় ধরণের প্রশ্নসাপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়। অন্যদেশের গুপ্তচর নিজদেশে প্রায় খোলাখুলিভাবে শুধু 'যৎকিঞ্চিৎ পাতলা আবরণের' (Cover, কূটনৈতিক পরিচয়) আড়ালে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু যখনই ঐ 'পাতলা আবরণ'টি খসে যায় তখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সে গ্রেপ্তার হতে চলেছে।

সকলের মনেই একটি মৌলিক প্রশ্ন জাগতে পারে "গুপ্তচর কেন?" এ ক্ষেত্রে সহজ স্বাভাবিক উত্তর হচ্ছে "টিকে থাকার জন্য"।

ক। প্রাচীন যুগে গুপ্তচরবৃত্তি (Spies in Ancient Times)

টিকে থাকার সংগ্রাম, পৃথিবীতে প্রাণ বা জীবন উদ্ভবের দিনের মতোই পুরানো। প্রাচীন প্রস্তর, লৌহ ও তাম্র যুগে আমরা পাথর ও ধাতব অস্ত্রের সন্ধান পাই। এ সব অস্ত্র-শস্ত্র শুধু খাদ্য সংগ্রহের জন্য নয় বরং হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ ও পরবর্তীতে সহযোগী মানুষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। টিকে থাকার সংগ্রাম শুধু অস্ত্রের গুণগত মান ও তার ব্যবহারের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল না বরং শত্রুর চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানের ওপর অর্থাৎ কখন, কোথায় এবং কিভাবে শত্রু আক্রমণ চালাবে এ সমস্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়েছে।

এ ধরণের তথ্য সংগ্রহের উপর টিকে থাকা ও বিজয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তথ্যের অভাব ও দুষ্প্রাপ্যতা পরাজয় ও মৃত্যু ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং টিকে থাকার এ সংগ্রামে কিছু লোক নিজেদের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করলো যারা 'জাসুস' (Spy) অর্থাৎ 'গুপ্তচর' হিসেবে পরিচিত। এ পদ্ধতি ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে এবং বর্তমানে যাকে আমরা 'এসপায়োনেজ' বলে জানি সে অভিধায় ভূষিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রেও গুপ্তচরবৃত্তির বিভিন্ন কাহিনীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'মনুর' চরিতাবিধানে এ ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ্য যে, "রাজা বা শাসনকর্তা অবশ্যই নিজদেশে ও তার শত্রুদেশে গুপ্তচরের মাধ্যমে খবরাখবর সংগ্রহ করবেন।" বেদ, মহাভারত, রামায়ণেও এরূপ বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়; রামায়ণে বিদেশি দেশগুলোয় গুপ্তচর মারফত লক্ষ্য রাখার জন্য বলা হয়েছে। তদ্রূপ মহাভারতে দুর্যোধনের গুপ্তচরবৃত্তির উদাহরণ

পাওয়া যায়। বাইবেলে হজরত মূসা (আ.) এর জাজের-এ গুপ্তচর পাঠানোর উল্লেখ্য আছে। (Nam xxi 32)।

খ। সান জু (San Tzu)

কখন এবং কোথায় একটি পূর্ণাঙ্গ এসপায়োনজ নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে তা বলা আজ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; বিশেষ করে আমরা যখন যিশু খ্রিষ্টের জন্মের শত শত বছর পূর্বের ঘটনাবলী নিয়ে অনুসন্ধান করি। রিচার্ড ডিকেন তাঁর 'A History of the Chinese Secret Service'-এ উল্লেখ করেছেন, যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৫১০ বছর পূর্বে 'সান জু', 'পিং ফা' (Pin Fa) বা 'Principle of War' শীর্ষক বইয়ে জানামতে সর্বপ্রথম যুদ্ধের কলাকৌশল ও এসপায়োনেজ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন। ওই বইটিতে বিশেষভাবে একটি গুপ্তচর সংস্থার সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। যদিও এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় তথাপি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গুপ্তচরবৃত্তি সম্বন্ধীয় ওই গ্রন্থটিই সবচেয়ে পুরোনো লিখিত নথি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দাবিদার।

'Principle of War' বইয়ে 'সান জু' পাঁচ প্রকার গুপ্তচরবৃত্তি ও পাঁচ ধরণের 'গুপ্তচর' সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এরা হচ্ছে যথাক্রমে-

স্থানীয় গুপ্তচর (Local Spy)

শত্রুদেশে ভালো আচরণ ও সহৃদয় ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকে এমন ব্যক্তি।

অভ্যন্তরীণ গুপ্তচর (Internal Spy)

শত্রুদেশের বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের 'তথ্যের সূত্র' হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে তদের গুপ্তচর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

রূপান্তরিত গুপ্তচর (Converted Spy)

শত্রুদেশীয় গুপ্তচরদের ঘুষের মাধ্যমে তাঁর নিজ সংস্থায় ভুল তথ্য পাচারে প্ররোচিত করা ও তাঁর নিজ জনগণের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা।

অনুপযুক্ত বা বাতিল গুপ্তচর (Condemned Spy)

যে সমস্ত গুপ্তচর শত্রু দ্বারা বন্দী হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করে।

সাধারণ গুপ্তচর (Ordinary Spy)

সাধারণ নিয়মিত ক্যাডারভুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর গুপ্তচর।

গ। কৌটিল্য'র আর্থশাস্ত্র (Kautilya's Arthashastra)

ভারতে কৌঠিল্যের 'আর্থশাস্ত্র' গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কিত লেখনীর জগতে সবিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। কৌটিল্য ইতিহাসে 'বিষ্ণুগুপ্ত' ও 'চাণক্য' নামেও সমধিত পরিচিত।

শ্যামসাস্ত্রী তাঁর 'আর্থশাস্ত্রে'র অনুবাদে এ বইটির রচনাকাল ৩২১ খ্রিষ্টপূর্ব সাল হতে ৩০০ শত খ্রিষ্টপূর্ব সালের মধ্যে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কৌটিল্য অত্যন্ত সুন্দর লৈখিক বর্ণনার মাধ্যমে 'মৌর্য'ও 'মৌর্য পরবর্তী' রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বইয়ে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ্য করেছেন।

কৌটিল্যের মতানুযায়ী গুপ্তচরদের প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যারা 'স্থানীয় এজেন্ট' ও 'পরিব্রাজক বা ভ্রাম্যমাণ এজেন্ট' (এরা আবার তত্ত্বাবধায়ক এজেন্ট রূপেও চিহ্নিত) হিসেবে পরিচিত। 'স্থানীয় এজেন্ট' তার কর্তৃত্বাধীনে যাদের নিয়োজিত করবেন তারা বিভিন্ন আবরণে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত। এরা হলো 'শঠ/অসৎ শষ্য', 'সন্ন্যাসী', 'গৃহস্বামী/গৃহস্থ', 'ব্যবসায়ী' এবং তপশ্চর্যায় নিয়োজিত 'যোগী/তাপস' শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব।

আবার 'পরিব্রাজক' বা 'ভ্রাম্যমাণ এজেন্টের' আওতায় আসা গুপ্তচররা হচ্ছেন 'সতীর্থ/সহযোগী গুপ্তচর', 'জনরোষ প্রজ্বলনকারী গুপ্তচর', 'বন্দী গুপ্তচর' এবং 'যাদুকর মহিলা গুপ্তচর'। কৌটিল্য এ সবের সাথে পুরোহিত ও সন্ন্যাসিনী গুপ্তচরের বিবরণও তাঁর বইয়ে উল্লেখ্য করেছেন; যা, তাঁর গুপ্তচর হিসেবে বিভিন্ন ও ব্যাপক প্রকৃতি বা পেশার লোকদের নিয়োজিত করার চাতুর্যপূর্ণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়।

যদিও কৌটিল্য একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু জনগণের 'ধর্মীয় অনুভূতির' নীতিজ্ঞান বর্জিত যত্রতত্র ব্যবহারে তাঁকে যথেষ্ট প্ররোচণা দিতে দেখা যায়। আবার গুপ্তচররা অসংখ্য অগণিত ছদ্মাবরণে লুকিয়ে কাজে নিয়োজিত থাকায় একে অন্যের সাথে বাস্তবসম্মত উপায়ে যতদূর সম্ভব অপরিচিত থাকাই বিধেয় বলে কৌটিল্য মনে করেন।

রাজা কৌটিল্য সবসময় শুধু একজন গুপ্তচরের সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করতে নিষেধ করতেন। তিনি এসপায়োনজে পাঁচটি স্তম্ভের বর্ণনা দিয়েছেন যা বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ততথ্যাদি পরীক্ষণ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইন্টেলিজেন্স বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং 'সাইফার' (গোপন লিপি) ও 'বহনকারী কবুতর'-এর মাধ্যমে গুপ্তচররা ইন্টেলিজেন্স তথ্যাদি প্রেরণ করবে।

গুপ্তচরদের অসংখ্যা দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাদের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চালচলন, কর্তব্য সম্পাদন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। রাজ্য ও রাজা সম্পর্কে জনোপলব্ধি রাজাকে জানাতে হয় এবং তাঁরা বর্বরতা ও অপরাধ শনাক্ত করার মাধ্যমে ন্যায়বিচার ও প্রশাসনকে সহায়তা করে থাকেন। সর্বশেষ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, তারা পার্শ্ববর্তী দেশের রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর উপর নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করবেন ও তাদের কৌশল শনাক্ত করে ধ্বংসের মাধ্যমে শত্রুর সাফল্যকে অকার্যকর করে দেবেন।

বিদেশী রাষ্ট্রসম্পর্কিত এসপায়োনেজ ব্যাপকভাবে তিনটি স্তরের ওপর নির্ভরশীল, যা বিশেষভাবে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক বিষয়াদির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক ইন্টেলিজেন্স পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ শত্রুদেশে প্রেরিত গোপন দূত, অসন্তুষ্ট ও বিশ্বাসঘাতক শ্রেণীর সাহায্য নেয়া হয় এবং পরবর্তীতে শত্রুদেশের ধ্বংস সাধনে এদের সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কূটনৈতিক ইন্টেলিজেন্স বা এসপায়োনেজ পরিচালিত হয় বিদেশে প্রেরিত রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের মাধ্যমে। শান্তিকালীন শুধু আলাপ-আলোচনা চালানোই এদের একমাত্র কাজ নয় বরং যে দেশে তাঁরা দূত হিসেবে প্রেরিত সে দেশের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণও তাঁদের একটি অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ কাজ। এ ক্ষেত্রে যে সব তথ্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে তাঁদের নিজ দেশের স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত তা সংগ্রহ করায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রদূতগণ (বর্তমানকালের দূতগণও) শুধু তাঁদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বই করেননি বরং সাথে সাথে প্রচলিত আইনের ছাতার নিচে একজন সম্মানিত (!) গুপ্তচর হিসেবেও কাজ করেছেন।

অন্যদিকে সামরিক ইন্টেলিজেন্সে কিছু গুপ্ত এজেন্টকে প্রশিক্ষণদান শেষে নিয়োগ করা হতো- শত্রুদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রকৃত ও নিখুঁত সম্পদ (অস্ত্রশস্ত্র) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, তাদের পরিকল্পনা, চলাচলের দিকে নজর রাখা এবং সর্বোপরি নিজ সশস্ত্র বাহিনীকে শত্রুর বিষাক্ত গোয়েন্দা তৎপরতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য।

এরপরও কৌটিল্য অগ্রসর বিভিন্ন শিবিরে ও অগ্রবর্তী সীমান্তে গুপ্তচর নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। এ সব গুপ্তচরের একটি অবশ্যকরণীয় কাজ ছিল 'নিজেদের সমরসজ্জার সাফল্যকীর্তন করা ও শত্রুর ক্রমাগত ব্যর্থতার' প্রচারণা চালিয়ে নিজ সেনাবাহিনীর মনোবল চাঙ্গা রাখা ও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল মানসিক বা স্নায়বিক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া। এছাড়াও তারা শত্রুকে বিব্রত, তাঁদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি ও শত্রু দেশের রাজাকে তাঁর দূর্গ পতন কিংবা পুড়ে যাওয়া, রাজপরিবারে বিদ্রোহ অথবা অন্যকোনো শত্রু বা জংলি রাজার আন্দোলনের সংবাদ দিয়ে হতচকিত করার কাজে ব্যাপৃত থাকতো।

এসপায়োনেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কোনো প্রক্রিয়া গ্রহণ করা 'জায়েজ' বলে স্বীকৃত– যেমন- গুপ্তচরবৃত্তি, মিথ্যা কথা, ঘুষ, বিষ প্রয়োগ, নারীর ছলনা ও গুপ্তঘাতকের ছুরি। *শক্তিশালী প্রতিবেশীর শাসানিতে ভীত ছোট রাষ্ট্রের রাজার প্রতি কৌটিল্য মূলত গুপ্তচরদের ওপর নির্ভর করতে ও 'ষড়যন্ত্র যুদ্ধ' (Batte of Intrigues) এবং 'গোপন যুদ্ধ' পরিচালনার উপদেশ দিয়েছেন।* গুপ্তচরদের সাফল্য লাভের জন্য তাদের সর্বপ্রকার জালিয়াতি, চাতুরী, আগুন লাগানো ও চুরি-ডাকাতি করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে গুপ্তচরদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মিথ্যা সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে শত্রুসেনাদের হতাশ করা ও মন্ত্রী এবং সেনাপ্রধানদের আনুগত্যে ফাটল ধরানো। এ সব করার অন্তর্নিহিত রহস্য হলো শক্তিশালী প্রতিবেশীকে তার অভ্যন্তরীণ সমস্যায় সর্বদা ব্যতিব্যস্ত রাখা, যাতে সে কোনো 'বিদেশ অভিযানে' বের হবার কল্পনাবিলাসে ব্যাপৃত হতে না পারে।

ঘ। গুপ্তচরবৃত্তির ধারাবাহিকতা (The Game Continues)

'সান জু' ও 'কৌটিল্যের' যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত গুপ্তচরবৃত্তির কলাকৌশলের বিশেষ করে মৌলিক নীতিমালায় তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সম্পর্কের পরিবর্তন ও উন্নয়নের সাথে সাথে 'বহু পেশাভিত্তিক' ইন্টেলিজেন্স সংগঠনের জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে 'ইন্টেলিজেন্স' শব্দটি বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত। বেশিরভাগ লোকের নিকট গুপ্তচর, এজেন্ট, এসপায়োনেজ ও ইন্টেলিজেন্স প্রভৃতি 'নোংরা শব্দ' হিসেবেই পরিচিত। তাই ইন্টেলিজেন্স, বিশেষ করে বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্সের বিস্তৃত পরিধিতে যাবার আগে 'ইন্টেলিজেন্স' শব্দটিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব।

যদিও কৌটিল্যের ব্যাখ্যায় আমরা এ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ভালো ধারণা পাই তবুও সহজ ভাষায় বলতে গেলে, 'র'-এর একজন প্রশিক্ষকের উদ্ধৃতি মতে "নির্জলা বা অপরিণত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সেগুলোতে পরিণত তথ্যে রূপান্তরই" ইন্টেলিজেন্স। তিনি এ ব্যাপারে আরো উল্লেখ্য করেন, "এটা বলা ভুল হবে যে, আমরা যে কোনো সূত্র থেকে অনেক ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করেছি, কারণ প্রকৃত ইন্টেলিজেন্স তখনই পাওয়া যায় যখন কেবল প্রাপ্তনির্জলা তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বলতে গেলে শুধু সদর দপ্তরই ইন্টেলিজেন্সের মূল আধার, প্রস্তুতকারী ও প্রক্রিয়াজাতকারী।"

তথ্য সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ কোনো সহজ কাজ নয়। যে কোনো দেশ এসপায়োনেজের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তার ইন্টেলিজেন্স কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। ভারতের বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থার প্রথম পরিচালক আর, এন কাও-এর মতে "একটি বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স সংস্থা একটি দেশের বা সরকারের চোখ ও কান বিশেষ। এর কার্যকলাপ সরকারের বিভিন্ন নীতিমালার প্রতিফলন যা ব্যতীত একটি দেশ তার আঁতুড়ঘরে আবদ্ধ থাকে।"

তাই এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, কাও-এর মন্তব্য প্রমাণ করার জন্য কারো 'সান জু' বা 'কৌটিল্যের' উদ্ধৃতি টানার কোনো প্রয়োজন নেই।

অধ্যায়-২

যাত্রা হলো শুরু

From The Beginning

বৃটিশ সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলার সচিবালয়ে তিন দিন হ'লো অনবরত আগুন জ্বলছে। এটি ছিল বৃটিশ রাজনৈতিক বিভাগ ও অধিদপ্তরের অফিস। এখানে বৃটিশদের বছরের পর বছর ধরে সংগৃহীত মহারাজাদের 'ব্যক্তিগত জীবনের' গোপন নথিপত্র ধ্বংস করতে দেখা যায়। ওই সব গোপনীয় তথ্য বৃটিশদের বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের 'ব্ল্যাকমেইল' করতে সহায়তা করে এবং তাঁরা (মহারাজারা) তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলতে বাধ্য হন। মহারাজাদের জন্য 'বিশেষ ব্যবস্থার' উল্লেখ্য ছাড়াও ওই দলিলপত্রে বৃটিশদের বিশেষ অনুগত 'তথ্যসরবরাহকারী' ও 'দালালদের' সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণ মজুদ ছিল। তারা (বৃটিশরা) এখন ভালয় ভালয় বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু পুরানো দলিলপত্র হস্তান্তর করা তাদের জন্য ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। সারা ভারতে যেখানেই বৃটিশদের ওই ধরণের কোনো সংবেদনশীল দলিলপত্র রক্ষিত ছিল সেখানেই 'সিমলার ন্যায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়'। আগুন নিভে যাবার সাথে সাথে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে বৃটিশদের পক্ষাবলম্বনকারী গুপ্তচর ও সমর্থকদের নাম চিরতরে মুছে যায়। যখন সঞ্জীব পিল্লাই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রথম পরিচালকরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন এ সংস্থা ছিল 'মাথা ও মাংসপেশী ছাড়া হাড্ডিচর্মসার একটি সংস্থা মাত্র'। ভারতীয়দের মধ্যে যারা ছিল সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সেই মুসলমানরা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বৃটিশদের চলে যাবার সাথে সাথে নব্যস্বাধীন পাকিস্তানে চলে যায়। বৃটিশ শাসনাধীনে পরিচালিত গোয়েন্দা দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে যাঁর সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা ছিল সেই গোলাম মোহাম্মদ ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তর ছেড়ে একে প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তান গোয়েন্দা দপ্তরের প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।

ক। বৃটিশ গুপ্তচরবৃত্তির স্বার্থ (British Intelligence Interests)

ভারতে বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর স্বার্থ মুখ্যত দুটি বিষয় ঘুরে আবর্তিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তব্যাপী আফগান ও উপজাতিদের সাথে স্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ এবং সীমান্তের ওপারে রাশিয়ার অবস্থান-বৃটিশদের এদিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশ জুড়ে রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী তৎপরতার আশঙ্কা 'খাঁটিসত্য' বলেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে ও উপমহাদেশের কর্তৃত্ব নিয়ে একটি 'এ্যাংলো রাশিয়ান' যুদ্ধ শুধু আশঙ্কা নয় বরং অবশ্যম্ভাবী রূপ ধারণ করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী (MI-6) এবং বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত 'গোয়েন্দা দপ্তর' অত্যন্ত কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের অনুপ্রবেশ ঘটে

তখন গোয়েন্দা দপ্তরকে বৃটিশ ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় মনোনিবেশ করতে আদেশ দেয়া হয় এবং সীমান্তের বাইরে 'বার্মা' ও 'সিঙ্গাপুর' নিয়ে MI-6 ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ইতোমধ্যে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম গতি লাভ করতে সক্ষম হয় ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত 'অহিংস' আন্দোলন অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংস্থার অংশগ্রহণে সহিংসরূপ পরিগ্রহ করে। এ সমস্ত আন্দোলন বৃটিশ সরকারকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে এবং গোয়েন্দা দপ্তর ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের বিভিন্ন নেতৃবর্গের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হয়।

গোয়েন্দা দপ্তরের প্রাথমিক কাজ ছিল বৃটিশ ভারতের সব রাজনৈতিক দলের ওপর বিশেষ ফাইল বা রেকর্ড রাখা। এদিকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন গতি লাভ করে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বে 'ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী' (Indian National Army) গঠন করা হয়। এর নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা ছিল এবং 'নেতাজী' বৃটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করার চেষ্টায় জাপানী ও জার্মান কর্তৃপক্ষের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে থাকেন। গোয়েন্দা দপ্তর এ সব কার্যক্রম মোকাবিলা করার জন্য ভারতের বিভিন্ন শহরে বিশেষ গোয়েন্দা সেল গঠনের উদ্যোগ নেয়। এ সব সেলের দায়িত্বে ছিলেন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা, যার অফিস ছিল গোয়েন্দা সদর দপ্তরে। যে সব ভারতীয় ওখানে কাজ করতেন তারা বৃটিশদের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত ছিলেন।

সীমান্তের বাইরে গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ সামরিক ধাঁচের হওয়ায় ওগুলোর দায়িত্ব 'MI-6' এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। 'MI-6' তখন অনেকের কাছে বৃটিশ রাজের গোপন সংস্থারূপেই পরিচিত ছিল। বৃটিশরা নিজেরাই ভালো বলতে পারবে কি কারণে তারা এখন পর্যন্ত অনবরত এ ধরণের একটি সংস্থার কথা অস্বীকার করে আসছে? বৃটিশ আইন অনুযায়ী 'অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের' আওতায় কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী ওই 'সংস্থা প্রধানের' নাম পর্যন্ত উল্লেখ্য করতে পারেন না।

খ। নব যাত্রা (Building Up De Novo)

বৃটিশ 'গোয়েন্দা বাহিনীর' ছেড়ে যাওয়ার তথ্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য না করেও এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাদের ফেলে যাওয়া দলিলপত্র ও তথ্যাদি নব্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর (IB=Intelligence Bureau) কোনো উপকারে আসেনি। বরং যা অবশিষ্ট ছিল তা হলো 'তলাহীন ঝুড়িতে' সংরক্ষিত অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র। সুতরাং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই আবার 'প্রথম থেকে' যাত্রা শুরু হয়। মূলত: একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থার (IB) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সে অনুযায়ী রূপরেখা প্রণয়ন করায় বৈদেশিক গোয়েন্দা দপ্তরের ফাইলপত্র সরকারের টেবিলে অবহেলায় পড়ে থাকে।

দু'বছর পর ১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে পিল্লাই একটি ছোটখাটো বৈদেশিক গোয়েন্দা

সংস্থা সংগঠিত করেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাকিস্তান, জার্মানি ও ফ্রান্সের দূতাবাসে 'ফার্স্ট সেক্রেটারী' পদমর্যাদার একটি পদ সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দেনদরবার চালিয়ে যান।

প্রথম ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ওই সব দেশে নিয়োগ লাভ করেন। জার্মানী ও ফ্রান্সে নির্বাচিত কর্মকর্তারা নিয়মিত গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য ছিলেন না বা তাদের অন্যান্য সংস্থা থেকে সংগ্রহ করায় তাঁদের পরিচয় শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

গ। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (Internal Feuds)

এক বছর পর, ১৯৫০ সালের শেষদিকে পিল্লাই স্বরাষ্ট্র সচিব আর, এন, ব্যানার্জির সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। স্বরাষ্ট্র সচিবকে তার সমসাময়িক সকলেই 'নিজস্ব তৈরি আইনে বাচাল কাজে পারদর্শী' বলে ভাবতেন, যিনি (স্বরাষ্ট্র সচিব) সবসময় তাঁর সাথে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের বিশেষ সুসম্পর্কের কথা ফলাও করে প্রচার করতে ভালোবাসতেন। পিল্লাই ও ব্যানার্জীর ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়তে থাকে ও এ ব্যাপারে সরব আলোচনার সূত্রপাত হয়, যখন পিল্লাই যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A) শিক্ষা সফরের ওপর রিপোর্ট পেশ করতে দেরি করে ফেলেন, যেখানে সি আই-এর ওপর বিশেষ পর্যালোচনা সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত ছিল। এ দেরি করে ফেলাই শেষ পর্যন্ত 'সঠিক চিন্তার উপযুক্ত ব্যক্তিটির' দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং শীঘ্রই পিল্লাই অপসারিত হন ও বি এন মালিক গোয়েন্দা দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ঘ। বি এন মালিকের দায়িত্ব গ্রহণ (B.N. Malik Takes Over)

ভারতীয় পুলিশ বিভাগের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির গোয়েন্দা বাহিনীর (IB) প্রধান পদে নিযুক্তির রীতি ভঙ্গ করে বি এন মালিককে তড়িঘড়ি নিয়োগ দান করা হয়। এ জন্য তিনি এক বছর অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন। ততোদিনে মালিক পিল্লাই প্রবর্তিত পদ্ধতির ভালো দিকগুলোর যৌক্তিকতা স্পষ্ট বুঝতে পারলেও ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। তাঁর গৃহীত প্রথম 'পুনঃ মেরামত করা'র পরিকল্পনা মতে পিল্লাইয়ের বিদেশে পাঠানো প্রথম দু'জন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে দেশে ডেকে আনা হয়। তিনি এভাবে "পূর্বসূরি সিনড্রোমের" প্রচলন করেন এবং আজ পর্যন্ত ওই ধারাই সকলে অনুসরণ করে আসছে। ভালো হোক আর মন্দ হোক 'পূর্বসূরির' হাতে নিয়োগ পাওয়া কোনো ব্যক্তিকে নতুন প্রধান আসার সাথে সাথেই বদল করা হয়।

ওই বিশেষ 'দু'জন' কর্মকর্তাকে সরিয়ে আনার পর, তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় গোয়েন্দা বৃত্তির জাল ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আরো অনেক লোককে নতুন নতুন জায়গায় নিযোগ করেন- বিশেষ করে চীনে নজর রাখার জন্য তিব্বত ও সিকিমের 'আউটপোস্ট' দুটো ব্যবহার করা হয়। বৃটিশ পরিত্যক্ত এ 'আউটপোস্ট' দুটো তখন পর্যন্ত অব্যবহৃত ছিল।

১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান (করাচী, লাহোর, ঢাকা), বার্মা ও সিলোনে (বর্তমান শ্রীলংকা) আরো নতুন 'আউটপোস্ট' খোলা হয়। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণের প্রয়োজনে 'বৈদেশিক ডেস্কের' সংখ্যা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

ঙ। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ (১৯৬৫-১৯৬৮)

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যবর্তী বছরগুলোয় গোয়েন্দা সংস্থায় (IB) এস পি ভারমা ও এম এম এল হোজা নামে আরো দু'জন পরিচালক রূপে নিয়োজিত হন। এদিকে কর্মক্ষেত্রও দিনদিন প্রসারিত হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ সমকেন্দ্রিক বৃত্তছোয়া বার্মা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও নিকট পরিমণ্ডলে অবস্থিত দেশগুলো নিয়ে আরেকটি নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। যার প্রান্ত ছুঁয়ে ছিল মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অঞ্চল।

চ। পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা এজেন্সির জন্ম (Birth of Separate Foreign Intelligence Agency)

এর দ্রুত বৃদ্ধিলাভ সত্ত্বেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ধারণা করা হয় যে, 'ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা ডেস্ক' একটি 'হতাশাপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে'। কারণ এ সংস্থা ভারতের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত তথ্য, বিশেষ করে পাকিস্তানের অভিপ্রায় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতেও ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বেশি কর্মকর্তাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে এবং গোয়েন্দা সংস্থায় অতি আবশ্যকীয় সমন্বয় ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ 'বৈদেশিক ডেস্কে' নেই বললেই চলে।

১৯৬৮ সালের মধ্যে ভারতে একটি উপযোগী ও আলাদা বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইতোমধ্যে ১৯৪৭-৪৮ সালে পাকিস্তানের সাথে সংঘর্ষে এরূপ সংস্থার অনুপস্থিতি প্রচণ্ড বিপর্যয় ডেকে আনে; অবশ্য তখন 'অভ্যন্তরীণ' ও 'বৈদেশিক' কোনো গোয়েন্দা সংস্থার আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এর পরপরই ১৯৬২ সালে চীনের আগ্রাসন ও তারপর পাকিস্তানের সাথে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা এজেন্সি না থাকায় বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ১৯৬৭ সালে সিকিমের 'নাথুলা'য় গোলন্দাজ গোলা বিনিময়ের সময়ও এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল (চীনের সাথে সংঘর্ষ)।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে চীনা সীমান্ত সচল হয়ে ওঠে এবং চীন-ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের হুমকি দেয়। অবশ্য পরে চীন এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান বিরোধের সময় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ভারতে হতাশাব্যঞ্জক অপ্রতিভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর ভারতীয় চিন্তাবিদরা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে একটি পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করেন।

পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর

সদস্যরা একে অপরের ওপর দোষ/দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। দু'সংস্থার লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান স্বয়ং এই বলে প্রচারে অংশ নেন যে, "প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সহজলভ্য নয়।" কিন্তু এ সব লোকদেখানো সম্মুখ সমরের পশ্চাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর কিছু কিছু অংশ নিজেদের আওতায় বৈদেশিক গোয়েন্দা বাহিনী গঠনের তদ্বির চালিয়ে যায়। বিষয়টির নিষ্পত্তি ও কর্তব্যে অবহেলার দোষারোপ তদারকের জন্য অবশেষে প্রতিরক্ষা সচিব পি ভি আর রাও এবং স্বরাষ্ট্র সচিব এল পি সিং সমম্বয়ে দু'সদস্যের একটি 'কমিশন' গঠন করা হয়।

কে. শংকর নায়ার তখন গোয়েন্দা সংস্থার (IB) পাকিস্তান ডেস্কে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁকে ৬০টির অধিক গোয়েন্দা রিপোর্ট (পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থান থেকে এজেন্টদের পাঠানো বিভিন্ন রিপোর্ট) সঠিকভাবে সন্নিবেশিত/সংকলিত করার আদেশ দেয়া হয়। দু'সদস্যের কমিশন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অভিযোগের সুষ্ঠু জবাব দিতে গোয়েন্দা সংস্থাকে (IB) নির্দেশ দেয়। নায়ার পরে এ ব্যাপারে উল্লেখ্য করেন যে, তিনি ও তাঁর সকল কর্মকর্তারা সে রাতে দু'টা পর্যন্ত যেসব রেকর্ডপত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তা সংগ্রহ করতে ফিলিং রোডের অস্থায়ী অফিসে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্মিত কেন্দ্রীয় সচিবালয় সন্নিকটস্থ ব্যারাক) কর্মব্যস্ত থাকেন। সমস্ত রিপোর্ট সংকলিত করার পর নায়ার মন্তব্য করেন, (যা পরে তাঁর অধীনস্থ এক কর্মকর্তা উল্লেখ্য করেছিলেন) "জন্ম বুদ্ধু ও হাবাগঙ্গারাম ছাড়া এ সব এড়িয়ে যাওয়া বা বুঝতে না পারা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।" নায়ার এ ক্ষেত্রে রিপোর্টে উল্লেখিত ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানী সমাবেশের প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের উল্লেখ করেছিলেন। শীঘ্রই একটি বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, রাও ও সিং দু'জনই নায়ারের প্রদত্ত 'জবাবের' সাথে একমত পোষণ করেন। কমিশন অতঃপর প্রাপ্ত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেন, "আনীত অভিযোগসমূহ ব্যাপক অর্থে সঠিক নয়, গোয়েন্দা তথ্যাদি সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু ওই সমস্ত তথ্যাদির সঠিক বিশ্লেষণ করা হয়নি, যদি তা করা হত তবে প্রাপ্ত গোয়েন্দা সূত্র সমূহই ধাঁধার উপযুক্ত জবাব দিতে পারতো। গোয়েন্দা সংস্থা ও এর বৈদেশিক গোয়েন্দা ডেস্ক ভালোভাবেই তাদের মাল-মশলা সরবরাহ করছিল।"

এদিকে ১৯৬৬ সালের শেষ থেকে ১৯৬৭ সালের শুরুর মধ্যবর্তী সময়েই পৃথক বৈদেশিক গোয়েন্দা এজেন্সি গঠনের ধারণা বাস্তবরূপ লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংস্থাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পরিচালনা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এ ধারণা ইতোমধ্যেই যুদ্ধকালীন প্রচারণা "প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সহজলভ্য নয়" এ যুক্তিকে লালন করেছে ও যার ফলশ্রুতিতে দু'সদস্যের কমিশন গঠন করা হয়। এ লক্ষ্যকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জেনারেল চৌধুরী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবনের তত্ত্বাবধানে ব্রিগেডিয়ার এম এন ভদ্রের পেশকৃত একটি রিপোর্টের পর্যালোচনা করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেয়ার প্রতিবাদ করা হয়। এ সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র ও

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ ও মনকষাকষির সৃষ্টি করে ও দুই মন্ত্রণালয়ই গোয়েন্দা সংস্থার একক দাবিদার বলে ধারণা পোষণ করতে থাকে।

এরপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটিকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নতুন গঠিত বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার স্থপতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং ও তার প্রধান মুখ্য সচিব পি এন হাকসার। তাঁরা উভয়েই বিস্তৃত পরিসরে, ভারতের বৈদেশিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৬৮ সালে এ সংস্থার জন্ম ও এর চূড়ান্ত অবকাঠামো তৈরির সময় কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। জনগণ ক্রমান্বয়ে অভিযোগ করতে থাকে, এ সংস্থা শ্রীমতী গান্ধীর "গোপন পুলিশ বহর" বই আর কিছুই নয় এবং সম্ভবত শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রী চ্যবনের অতীত মতদ্বৈততার কারণেই (প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার ব্যাপারে) এ ধরণের জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু খুব কম জনগণই তখন এটা বুঝতে সক্ষম ছিল যে, শ্রী চ্যবনের মতামত ও অনুমোদন নিয়েই বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তি তদারকে পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অন্যান্য আর যে কারণ 'বিকৃত চিত্র অঙ্কনে' সাহায্য করে, তা হলো, ভারত আর দশটা উন্নয়নশীল (কিছু কিছু উন্নত দেশও) দেশের মতো বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থাকে 'বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা' হিসেবে উল্লেখ করতে ইতস্তত করে আসছিলো।

ছ। নতুন নামের সন্ধানে (Search For A New Name)

এরপর নতুন সংস্থার জন্য উপযুক্ত নাম খোঁজার পালা। সম্ভবত কেবিনেট সচিবের দেয়া দীর্ঘ তালিকা থেকে রিসার্চ এন্ড অ্যানালিসিস উইং নামটি বাছাই করা হয় এবং এভাবেই ভারতের প্রথম বৈদেশিক গোয়েন্দা বাহিনীর জন্ম হয়।

প্রথমে "R. & A. W." হিসেবে উল্লেখ করা হলেও পরবর্তিতে সাংবাদিক সমাজ এ সংস্থাকে "R AW" নামে উল্লেখ করা আরম্ভ করে, যা আজকের বিশ্বে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও প্রচলিত।

অধ্যায় : ৩

'র'-এর গঠন প্রক্রিয়া

The Coming of RAW

'র' তার 'ছদ্মবেশি রূপের' প্রতিবিম্ব লুকিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু ১৯৬৯ সালে যখন কংগ্রেস ভেঙে যায়, তখন সরকারের পূর্ববর্তী সদস্যদের রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়, তাঁরা 'র' সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা বলা আরম্ভ করেন। 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার' জুলাই সংখ্যায় বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ্য করা হয় যে, ভারতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহ ভারতের গুপ্ত সংস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে। এরপর 'বিশেষ সংবাদ' সংগ্রহ ও ছাপার জন্য প্রচার মাধ্যমে তীব্র আলোড়ন ও চিৎকার চেঁচামেচির সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটির পর একটি 'গল্প' ছাপা হতে থাকে। ঠিক তখনই 'র'-এর প্রধান হিসেবে 'কাও'-এর নাম উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

ক। 'র' গঠনে কাও ও শংকর নায়ারের মিলিত প্রচেষ্টা (Kao With Sankaran Nair Build RAW)

'র'-এর প্রধান পদটির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ অভিজ্ঞতা ও গুপ্তচরবৃত্তির বিশেষ নৈপুণ্যে পারদর্শী খুব কম লোকই শনাক্ত করা সম্ভব ছিল। অবশেষে সকলে কাও-এর দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং ভারতীয় সরকারও তাঁর থেকে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির সন্ধান না পেয়ে তাঁকে নিয়োগ দান করেন।

রামেশ্বর নাথ কাও আই বি (IB) তে তাঁর কার্যকালে গুপ্তচরবৃত্তি ও গোয়েন্দা জগতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিরূপে সকলের নজর কাড়তে সমর্থ হন, যিনি নেহরুর সময় ষাট দশকের মধ্যভাগে মাঠপর্যায়ে কর্মরত ছিলেন। তখন ১৯৬০ সালের ১ জুলাই ঘানা সদ্য স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে প্রেসিডেন্ট নক্রুমা ঘানায় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের জন্য ভারতের সাহায্য লাভের আশা প্রকাশ করেন। নেহেরু এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান এবং এর পরপরই দু'জন কর্মকর্তা যথাক্রমে আর এন কাও ও কে শংকর নায়ারকে প্রেষণে (Deputation) ঘানায় পাঠানো হয়। এ দু'ভদ্রলোকই পরবর্তী বছরগুলোতে এলোমেলো অবস্থা থেকে ঘানার গুপ্তর সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তাদের কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে শূন্য অবস্থা থেকে ঘানার গুপ্ত সংস্থা একটি অবয়ব লাভে সক্ষম হয়। কাও এর অবকাঠামো রূপায়ণ করেন ও ভিত্তিস্থাপনের পর নায়ার তাঁর ক্রমাগত চেষ্টায় 'ঘানা গুপ্তচর সংস্থা' সচল করে তুলতে সক্ষম হন।

তাদের ঘানায় অর্জিত সুনাম ও অতীতের মাঠপর্যায়ের দক্ষতা তাদের একটি সম্মানজক অবস্থানে পৌছতে সাহায্য করে। আট বছরের মধ্যে (ঘানার কাজ করার পর) তাদের যথারীতি মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতাধীন R. and A. W-এ (Research & Analysis Wing) দায়িত্বশীল আসনে নিয়োগ করা হয়। অবশেষে ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর R. and A. W গঠনের চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা হয়। বড় কোনো হৈ চৈ ছাড়াই কাও ও নায়ারসহ আরো ২৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী IB থেকে 'র'-এর 'ছায়ায়' বদলি হয়ে আসেন।

তাৎক্ষণিকভাবে 'র'-এর কার্যালয় ও আনুষঙ্গিক স্থাপনার জন্য স্থান সংকুলান প্রাথমিক অসুবিধার সৃষ্টি করে ও রাজধানী নয়াদিল্লি ততোদিনে অসংখ্য অফিস-আদালতের ভারে নিমগ্ন প্রায়। তাই শুরুতে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের উত্তর ব্লকে 'র'-এর কার্যক্রম শুরু করতে হয় এবং দক্ষিণ ব্লকের তথাকথিত 'স্পেশাল উইং'-এ কাও তাঁর নিজস্ব অফিস স্থাপন করেন। অতঃপর অবকাঠামো অপরিবর্তিত রেখে কিছু সংস্কার সাধন করা হয় এবং পৃথক আরেকটি 'ক্যাডার' গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

গোয়েন্দা কার্যক্রমের শুরুতে, ভারতের প্রাথমিক মাথাব্যথা পাকিস্তান ও চীন সংক্রান্ত ডেস্কের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সাধন জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। 'রাও ও সিং কমিশন' ১৯৬৫ সালের ব্যর্থতার জন্য সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য ও এর গবেষণা এবং পর্যালোচনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে দায়ী বলে মত প্রকাশ করেন। শংকর নায়ার, যিনি পূর্বে IBতে পাকিস্তান ডেস্কে কর্মরত ছিলেন, তিনি এ সব 'ব্যবধান' চিহ্নিত করতে ও এর সমাধান দিতে সক্ষম হন। পূর্বের চিন্তাধারা অনুযায়ী IB থেকে 'র'-এ লোক নিয়োগ স্থগিত করে তৎপরিবর্তে বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষ পেশায় দক্ষ লোকদের 'বিশেষ কাজের' জন্য বাছাই করা হয়। এ পদক্ষেপ পরবর্তীতে ব্যাপক বিদ্বেষ ও রেষারেষির জন্ম দেয় কারণ 'অন্য সংস্থার ও বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তিত্বের গোয়েন্দা পেশায় আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা' এ নিয়ে নানাজন নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

'র' ১৯৬৮ সালে-এর প্রাথমিক স্তরে দুটি সংস্থার সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। এ দুটো সংস্থা ছিল ব্রিগেডিয়ার ভদ্র পরিচালিত 'সেনা গোয়েন্দা পরিদপ্তর' এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; বিশেষ করে ভারতীয় বৈদেশিক সার্ভিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভেঙে যাওয়ায় সরকারি অবকাঠামোর পুনর্গঠন করা হয় ও মুখ্যতঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্ব গোয়েন্দা শাখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার দায়িত্ব (CBI) জনশক্তি বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সকলের 'হৃদয় জ্বালা' সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য 'র' প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রণালয়ে (এর) জায়গা করে নেয়।

'র'-এর কার্যক্রম দিন দিন সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সলে ২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ এর বার্ষিক বাজেট ছিল দুই কোটি রুপি। তবে অল্পসময়েই এর বরাদ্দ ১০

কোটি রুপিতে উন্নতি হয় (যদিও এ খসড়া আনুমানিক হিসেবমাত্র, আসল হিসেব জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কখনই প্রকাশ করা হবে না) এবং লোকবল ৭০০০ এ বৃদ্ধি পায়। ভারত সে সময় প্রতিবছর মাথাপিছু মাত্র ২০ পয়সা বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য খরচ করে। 'র' প্রধানকে ক্রমান্বয়ে আরো অধিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তিনি তাঁর সকল কাজের জন্য সরাসরি একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। এ দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে আমলাতান্ত্রিক 'লাল ফিতার বেড়াজাল ছিন্ন করে' দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয় এবং সংস্থায় সাংগঠনিক সাবলীলতা ফিরে আসে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু 'গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকারী' সংস্থা হিসেবে 'র'-এর নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু পরে পররাষ্ট্র নীতির আওতায় পরিচালিত আরেকটি বিশেষ অপারেশনাল শাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ পরিকল্পনা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর ফল লাভে সক্ষম হয় (বাংলাদেশ ও সিকিম অপারেশন এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত)।

খ। অপারেশনাল শাখা (The Operational Arm)

ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থায় 'স্পেশাল অপারেশন ব্রাঞ্চের' 'বিশেষ অপারেশনাল শাখা' গোয়েন্দা জগতে কোনো নতুন সংযোজন নয়। এ রকম একই ধরণের শাখা সি আই এ, কেজিবি ও বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনী এস আই এস (Sceret Intelligence Service)-এও রয়েছে।

এ ধরণের অপারেশনাল শাখা সময়ে সময়ে যখন প্রয়োজন হয় তখন ব্যাপক গোয়েন্দা নীতিমালা প্রণয়নে বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। যদিও 'র' ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা সাধারণত প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকার চেষ্টা করে কিন্তু অনিবার্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রচলিত ধারার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, যা ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে এবং এ রকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অপারেশন' সফল নাও হতে পারে। এখানে কিছুদিন পূর্বে সি আই এ পরিচালিত 'জিম্মি উদ্ধারের' (ইরানে মার্কিন দূতাবাসে আটক জিম্মি উদ্ধার প্রচেষ্টা) ব্যর্থতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য করা যায়।

কিন্তু সব সময় এটা ভাবা ঠিক নয় যে, বিশেষ অপারেশন সম্পূর্ণ অপারেশনের সাফল্য ব্যর্থতার নিয়ামক। ইরানের 'জিম্মি উদ্ধারের' অপারেশনাল ব্যর্থতা সি আই এ'র ইরানে সম্পৃক্ততার পুরোপুরি ইতি ঘটায়নি এবং 'বাংলাদেশ অপারেশনেও' এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে।

আবার অনেক 'বিশেষ অপারেশনে' ব্যাপক ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষ করে যেখানে প্রথাগত কূটনৈতিক দেনদরবার সম্ভব নয়, সেখানে সাধারণত বিভিন্ন সরকারের সাথে 'বিশেষ ব্যবস্থায়' সম্মত হতে হয়। মাঝে মাঝে সে দেশের স্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে পর্যন্ত এ ধরণের কাজে সাহায্যের আহ্বান জানানো হয়ে থাকে। এ

রকম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'মোশে দায়ান' ও 'মোরারজী দেশাই'-এর মধ্যে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক গোপন বৈঠক, যার মাধ্যমে একটি 'বিশেষ' অপারেশনে বিদেশী গোয়েন্দা বাহিনীর সাহায্য নেয়া হয়েছিল।

(তখন ইসরাইলের সাথে ভারতের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না : অনুবাদক)

গ। 'র'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ (RAW Objectives)

ব্যাপক অর্থে 'র'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত:

১। পার্শ্ববর্তী সকল দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী ও অবস্থান, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

২। দ্বিতীয়ত: 'র' আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সামজতান্ত্রিক মতভেদ সম্পর্কীয় ঘটনাবলীর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে; কারণ এ দু'পরাশক্তির ভারতীয় সমাজতান্ত্রিকতায় ও অন্যান্য দেশে সরাসরি সম্পৃক্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

৩। তৃতীয়ত: পাকিস্তানে বিপুল সমরোপকরণ সরবরাহ সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়, বিশেষ করে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ভারতের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়।

৪। সর্বশেষ কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য হলো যে, বিভিন্ন গোত্রের বিপুলসংখ্যক ভারতীয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে আসছেন, যারা ওই সব দেশে একটি জোরালো অবস্থানে আসীন এবং এ সব প্রবাসী গোয়েন্দা তথ্য জোগাতে পারে। সুতরাং 'র'-এর উচিৎ এ সব 'পরবাসী' ভারতীয়দের সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

অত্যন্ত জটিল ও 'টেকনিক্যাল' তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে জড়ো করে ওগুলোর বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। তাই সংস্থার জন্য অত্যন্ত যত্ন ও নিরাপত্তার সাথে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই এর পর এজেন্ট নিয়োগ করতে হয়।

সংস্থার ব্যাপ্তি বাড়ার সাথে সাথে একটি 'নিয়মিত ক্যাডারের' প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয় যাদের সামনে দক্ষতা প্রকাশের মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভের পথ খোলা থাকে ও পদোন্নতি প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে 'র'-এর সকলেই ছিল অন্যান্য সংস্থার ধার কৃত সদস্য যাদের জন্য এক সময় 'পে-স্কেল' ও পদবীর সাদৃশ্য রক্ষা করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ বাহিনী থেকে আসা সদস্যদের 'পদোন্নতি' ও 'জ্যেষ্ঠতার' ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রীতি থাকলেও অন্যান্য অনেক বাহিনী ও সংস্থার লোকজন নিয়ে তীব্র সমস্যার সৃষ্টি হয় (বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর পদোন্নতি ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো ছিল অন্যদের

থেকে একেবারেই আলাদা প্রকৃতির)। আবার অনেকের ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বের সংস্থায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত পদোন্নতির কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এ সব সমস্যার কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি।

অতঃপর ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে একটি 'নিয়মিত ক্যাডার সার্ভিস' গঠনের মাধ্যমে সংস্থাকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ভিত্তি প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য সংস্থা থেকে লোক নিয়োগের সমস্যা দূর করা, যারা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থা থেকে আসার কারণে একই কাজ করে ভিন্ন বেতন পাওয়ার হতাশায় নিমজ্জিত ছিলেন। তখন শোনা গিয়েছিল যে, সরকার 'র এক্সিকিউটিভ ক্যাডার' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পূর্বেই 'জনতা পার্টি' সরকার গঠন করে এবং 'অনুমোদন' 'হিমাগারে' স্থান লাভ করে। এরপর এ প্রস্তাব শুধু কল্পনাই রয়ে যায় এবং 'র' পূর্বাপর অন্যান্য সংস্থা থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রেষণে (OSD) এক্সিকিউটিভ নিয়োগ অব্যাহত রাখে। এটা অবশ্য অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, 'র' গঠনের শুরুতে 'র'-প্রধান নিজে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেননি।

অধ্যায় : ৪

গুপ্তচরবৃত্তির কলাকৌশল
The Spy Strategy

সাধারণ জনগণের ধারণানুযায়ী গোয়েন্দা বৃত্তিতে নিয়োজিত একজন 'অপারেটর' সবক্ষেত্রেই একজন 'গুপ্তচর'। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা তা নয়। তবে তিনি (অপারেটর) গোয়েন্দা কার্যক্রমের কলাকৌশল ও গুপ্তচরবৃত্তির ধরণ সম্পর্কে ধারণা রাখেন। 'র' স্থাপনার একজন প্রশিক্ষকের মতে, "পূর্বে এমন একটা সময় ছিল যখন, আই বি-র (Intelligence Bureau) ট্রেনিং সেন্টারে অফিসারদের গুপ্তচরবৃত্তির ব্যাপক কলাকৌশল সম্পর্কে বিশদ প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। পরবর্তীতে অন্য গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ করে রাশিয়ার গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ স্কুলের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এ ধরনের প্রশিক্ষণে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি।" সুতরাং অল্প কিছুদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বিভিন্ন পেশার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শুধু তাদের বিশেষ সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

ক। সংগঠন (The Organization)

দেশের বিশেষ চাহিদা বা প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এমন একটি সংস্থা হিসেবে 'র'-কে সংগঠিত করা হয়েছিল। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। শুধু দেশের বাইরে 'র'-এর কার্যক্রম বিস্তৃত এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে-এর কোনো 'ভূমিকা' প্রযোজ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 'জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করার পর তার পরিচালক নির্বাচিত হন ভারতীয় সরকারের একজন 'সচিব' পদমর্যাদার কর্মকর্তা। 'র' প্রধান ও জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটির পরিচালক উভয়েই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অধীন বলে বিবেচিত হন। 'র'- পরিচালকের অধীনে ভারত সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব 'অফিস অব স্পেশাল অপারেশনস' (OSO) এবং বিভিন্ন দেশ হতে গোয়েন্দা তথ্যাদি সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এ ছাড়াও তিনি 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা', 'ইলেক্ট্রনিক টেকনিক্যাল সেকশন' ও 'সাধারণ প্রশাসন' বিভাগের তদারকি করেন। অতিরিক্ত সচিবের মতো মহাপরিচালক নিরাপত্তাও (DG Security) 'র' প্রধানের আওতাধীনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। এগুলো হচ্ছে 'এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার' (ARC) ও 'স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো' (SSB)।

অতিরিক্ত সচিবের (Addl. Director RAW) অধীনে পাঁচজন 'যুগ্ম সচিব' (Jt. Directors) কর্মরত থাকেন। যাদের চারজন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও

পঞ্চম জন 'ইলেক্ট্রনিক', 'প্রশাসনিক' ও 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা' বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাউন্টার এসপায়োনজ' যা প্রাথমিক পর্যায়ে 'র'-এর দায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল তা আই বি-র (IB) আওতায়ই থেকে যায়।

চারজন যুগ্ম পরিচালক (Jt. Director) পৃথিবীর নির্দিষ্ট অংশের জন্য সুনির্দিষ্ট চারটি ভিন্ন 'ডেস্ক' নিয়ন্ত্রণ করেন। এর মধ্যে প্রথম এলাকা হচ্ছে পাকিস্তান, দ্বিতীয় এলাকা চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, তৃতীয় এলাকা মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা এবং চতুর্থ এলাকা পৃথিবীর অন্যান্য স্থান/দেশ (চার্ট দ্রষ্টব্য)। এ সব ডেস্কের সাথে ক'জন 'ডেস্ক অফিসার' সংযুক্ত থাকেন, যিনি 'সদর দপ্তর' ও 'বিদেশী স্থাপনা' (Overseas stations) এবং 'স্থাপনা প্রধানদের' (Station Cheif) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। 'ডেস্ক অফিসার' হচ্ছেন 'স্থাপনা প্রধানের' সাথে মূল সংযোগকারী, যেখানে 'স্থাপনা প্রধান' 'কেস অফিসার' (Case officer) ও অন্যদের তদারক করেন এবং তিনি (Station Cheif) সাধারণত দূতাবাসে কোনো 'লোক দেখানো' আবরণের আড়ালে (Under cover) (যেমন-কালচারাল অ্যাটাশে বা ফার্স্ট সেক্রেটারি) কর্মরত থাকেন। 'ডেস্ক অফিসার' আবার তাঁর প্রতি বরাদ্দকৃত বিভিন্ন রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের গুরু দায়িত্বও বহন করেন। এ ক্ষেত্রে 'কেস অফিসার' তাঁকে আদিষ্ট 'অপারেশনের' জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করে থাকেন। সাধারণত একটি 'অপারেশন' বা 'প্রজেক্টের' জন্য একজন 'কেস অফিসার' নির্দিষ্ট থাকেন। তবে মাঝে মাঝে ক্ষেত্র বিশেষে তাঁকে অন্য আরো দু'একটি 'প্রজেক্ট' তদারকি করতে হতে পারে। 'কেস অফিসার' বিভিন্ন সময় 'প্রধান এজেন্ট'-এর (Principal Agent) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন, যিনি (প্রধান এজেন্ট) আবার অন্যান্য 'এজেন্ট' ও 'কেস অফিসারের' মধ্যে প্রধান যোগাযোগকারী এবং সাধারণত তিনি 'এজেন্টদের' স্বদেশীয়-স্বজাতি বা স্বগোত্রীয় হয়ে থাকেন।

একজন 'এজেন্ট' যিনি তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেন, তিনি যে দেশে গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানো হয় সেদেশীয় নাগরিক হিসেবে পরিচিত। আসলে একজন 'এজেন্টই' হচ্ছে একজন প্রকৃত 'গুপ্তচর'। একটি গোয়েন্দা অপারেশনে প্রধান অবলম্বন হলো একজন 'রাজ প্রতিনিধি' (Resident) (যিনি দূতাবাসে কূটনীতিক হিসেবে সাধারণত Resident Agent হিসেবে গোয়েন্দা জগতে পরিচিত) যিনি বিভিন্ন চলমান অপারেশন বা গোয়েন্দা কর্মকাজের গতিবিধির সাথে সমান তাল রক্ষা করে অপারেশনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। একজন 'Resident Agent' কখনই প্রকাশ্যে বা সরাসরি কোনো গোয়েন্দা কার্যক্রমের সাথে নিজেকে ঘুণাক্ষরেও জড়িয়ে ফেলেন না। তিনি সাধারণত অপারেশনের পরপর সবকিছু ঠিকঠাক করতে বা প্রমাণ নষ্ট করতে চেষ্টা করেন ও যদি অপারেশন ব্যর্থ হয় তবে বিভিন্ন দিক সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মাত্র। কখনো কখনো অবশ্য তিনি 'কেস অফিসার', 'স্থাপনা প্রধান' ও 'অপারেশনের' সমন্বয় সাধনও করে থাকেন।

জনমনে সাধারণত ইন্টেলিজেন্স (Intelligence) ও 'এসপায়োনজ' (Espionage) শব্দ

দুটি নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় এবং স্বভাবতই এ দুটিকেই 'গুপ্তচরবৃত্তির' সমার্থক বলে ধারণা করা হয়। আসলে 'ইন্টেলিজেন্স' বলতে যখন কোনো দেশ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের যে চেষ্টা চালায় তাকে বোঝানো হয়; সেখানে তথ্য সংগ্রহকারী সংস্থা বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বাহিনী, সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এমনকি গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এ ব্যাপারে মাইলস্ কপল্যান্ডের (Miles Copeland) ভাষায়, *"যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা, তিনি যে কোনো পর্যায়েই কর্মরত থাকেন না কেন, যখন তিনি সরাসরি গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন তখন তাকে একজন 'ইন্টেলিজেন্স' কর্মকর্তা বলা যায়। এ সমস্ত কর্মকর্তা হতে পারেন- রাষ্ট্রদূত, অ্যাটাশে (সামরিক, নৌ, বিমান), সিভিল এভিয়েশন, বাণিজ্যিক, পেট্রোলিয়াম অথবা কৃষি সংক্রান্ত অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রের কর্মকর্তা, এমনকি প্রশাসনিক ও উপদেষ্টার কাজে নিয়োজিত ছাড়া সকল দূতাবাস কর্মকর্তা/কর্মচারীই 'ইন্টেলিজেন্স'-এর সাথে জড়িত থাকতে পারেন।"*

কিন্তু 'এসপায়োনেজ' একটি ভিন্ন ধরণের গোয়েন্দাবৃত্তি যা সাধারণত, যে সব তথ্য স্বাভাবিকভাবে সংগ্রহ করা যায় না, তা সংগ্রহের ওপর জোর দেয়। ইন্টেলিজেন্সের মতো 'নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের' একই উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে 'বিশেষ অপারেশনের' মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বর্তমানকালে, একটি 'বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থাকে' বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। সে ক্ষেত্রে কখনো মুক্ত স্বাধীনভাবে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও এর বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে জটিল বিশেষ অপারেশন পর্যন্ত-এর আওতার মধ্যে পড়ে এবং এগুলো পরিচালনার জন্য সাধারণভাবে পরিচিত একটি 'স্পাইস্কুলের' প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

খ। গোদাদিয়া হোস্টেল (The Godadia Hostel)

'র'-এর জন্য প্রথম প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপন করা হয় 'গোদাদিয়া হোস্টেলে'। এ স্থানটি ছিল নয়াদিল্লির একপ্রান্তে একটি একমুখী রাস্তার ওপর 'আনন্দ পর্বত' পাহাড়ের চূড়ায়। এ ভগ্নপ্রায়, জীর্ণশীর্ণ আদিম প্রশিক্ষণ শিবিরটি দীর্ঘদিন থেকেই প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হয়তো বৃটিশদের কাছ থেকে এ পরিবেশে প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য আই বি (IB) কর্মকর্তারা এ ধরণের একটি স্থান প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশরা 'জেলখানায়' তাদের গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতো এবং এ ধরণের একটি 'গোপনতার বাতিক' থেকেই সম্ভবত আই বি কর্মকর্তারা আনন্দ পাহাড়ে, গোদাদিয়া হোস্টেলকে বেছে নিয়েছিলেন। এ স্কুলভবনটি 'র' প্রতিষ্ঠার পর কিছুদিন তাদের নতুন রিক্রুটদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

গ। বসন্ত বিহার ভবন (The Vasant Vihar House)

'র'-এর সংগঠন বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতিক হারে এর চাহিদারও বৃদ্ধি ঘটে। তাই দক্ষিণ দিল্লির আবাসিক এলাকার একটি সিনেমা হলের পিছনে একটি নতুন বাড়ির দখল

নেয়া হয়। পরে স্থান পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এ বাড়িতেই কাজ চালানো হতে থাকে। তখন রাজধানীতে প্রয়োজনীয় স্থানের দুষ্প্রাপ্যতা এ ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। ১৯৭০ সালের শুরুতে অনেক ব্যাপক পরিসরের একটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়। সেটি ছিল 'বসন্ত বিহার' আবাসিক এলাকায় একজন প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধানের বাড়ি।

'বসন্ত বিহারে' 'র' স্কুল স্থানান্তরের সাথে সাথে দু'পাশে দুটি চারতলা সহযোগী বিল্ডিংসহ 'র'-এর নিজস্ব এগারতলা বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকারীরা সব অপারেশনাল শাখাসহ পুরো সংস্থাটিকে 'একই ছাদের নিচে আনার' ধারণা কার্যকর করেন। এ সিদ্ধান্ত শুধু নিরাপত্তার খাতিরেই নয় বরং সংস্থাকে সাবলীল ও স্বল্পখরচে পরিচালনার জন্যও প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু 'র' অফিসসমূহ প্রথম দিকে কাছাকাছি বা একত্রে অবস্থিত ছিল না যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ এগুলো রাজধানীর বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল। সে সময় 'র' প্রধান বিজয় চকের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দক্ষিণ ব্লকে বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য অল্পকিছু কর্মচারী দিয়ে তাঁর কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন। অন্যদিকে অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগগুলো ছিল অফিসপাড়ার পূর্ব ব্লকের দু'টো তলায়, কিছু 'কনট প্লেসের' দোকান ও ব্যবসা-বাণিজ্য এলাকার উঁচু বাড়িগুলোয়, কিছু এফ আই সি সি আই বিল্ডিং-এ (যা বর্তমানে Natural History Museum) এবং স্পেশাল অপারেশন শাখার অফিস ছিল রামকৃষ্ণ পুরমে। এগুলো সবই ছিল ভাড়া করা বাড়ি। এ প্রেক্ষিতে 'র'-এর জন্য নতুন কমপ্লেক্স তৈরির প্রকল্প অনুমোদন করা হয় এবং ১৯৭৬ সালে 'নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের' জন্য 'মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস' (MES) কে ওই কমপ্লেক্স তৈরির জন্য নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু হঠাৎ কংগ্রেস সরকারের পতনে ও কিছুটা আমলাতান্ত্রিক লালফিতার দৌরাত্ম্যে 'র' অফিসসমূহ একত্রীকরণের স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। যদিও বাড়ি তৈরি অব্যাহত থাকে তবে 'দিল্লিওয়ালারা' 'স্পাই হাউস' (Spy House) নামে এর নামকরণ করেন। 'র'-এর নিজস্ব সুবৃহৎ বাড়ি (Mansion) তৈরির প্রচেষ্টাকে অভিহিত করা হয় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ বলে। জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পরপর অতিউৎসাহী কিছু ব্যক্তি, ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে 'র'-এর বিভিন্ন রক্তাক্ত খুনাখুনি ও দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিষয়ে চিৎকার চেচাঁমেচি জুড়ে দেন। বিভিন্ন জনের অপপ্রচারেও 'র'-এর এধরণের ভাবমূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আদেশ দেয়া হয়, যেখানে 'র'-কে নতুন তৈরি কমপ্লেক্স অন্যান্য সংস্থার সাথে ভাগাভাগি করে অফিস স্থাপনের জন্য বলা হয়। সুতরাং একই বাড়িতে ও একই ছাদের নিচে সকল স্থাপনার (one roof conceptt) চিন্তা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করে 'র' চুপচাপ অন্য পন্থা গ্রহণ করে। এ পরিণামদর্শী গোপন ব্যবস্থায় 'র'-এর উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা কিছু কম পরিচিত স্থাপনা ও শাখাকে ওই বাড়িতে স্থানান্তর করেন যা পরে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয়েছিল। 'র'-বিরোধী চক্র এ ধরণের কোনো ব্যাপার সন্দেহ করার পূর্বেই ঘটনার আবর্তনে কংগ্রেস (আই) সরকার আবার

ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং এর সাথে সাথে 'র কমপ্লেক্স' নিয়ে সকল জল্পনা-কল্পনা, হৈ হুল্লোড় ধীরে ধীরে থিতিয়ে যায়।

ঘ। প্রশিক্ষণ স্কুল (Training School)

প্রশিক্ষণ স্কুল যা 'হাউস' নামে চিহ্নিত তা পরিচালক প্রশিক্ষণসহ পাঁচজন প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়, যার সকলেই স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত। ১৯৭০ সালে বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্সের সাথে সম্পর্কিত স্কুলের প্রশিক্ষণ এ স্কুলের আওতায় আনা হয়। 'ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিকিউরিটির' অধীন সকল এজেন্সিও এর সীমারেখায় পড়ে। তবে টেকনিক্যাল ও বিশেষ কোর্সের অপারেশনাল ট্রেনিংয়ের জন্য অন্যান্য সংস্থার প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের সাহায্য চাওয়া হয়। মোটামুটি এভাবে সকল প্রশিক্ষণ একই জায়গায় দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে।

শুরুতে ইন্টেলিজেন্স জগতে নতুন যোগদানকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে 'র' প্রশিক্ষকরা দারুণ সমস্যায় পড়ে যান। সে সময় ১৯৬৮ সালের দিকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে 'র' কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয়, যারা অনেকেই ছিলেন পুলিশ, আই বি ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য। ইতোমধ্যেই এরা তাদের পূর্বের সংস্থায় একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর হঠাৎ করে 'ইন্টেলিজেন্স' ও 'এসপায়োনজ' সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়ে যান। একজন প্রশিক্ষক পরে মন্তব্য করেন "এ সমস্ত নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রায়ই বৃটিশ, রাশিয়ান ও আমেরিকান গুপ্তচরদের বিভিন্ন উদাহরণ দেয়া হতো এবং তারা প্রতিনিয়তই একইরূপ ভারতীয় গুপ্তচরের কোনো ঘটনা শোনার আগ্রহ দেখাতো, কিন্তু 'র'-এ ধরণের খেলায় (গুপ্তচরবৃত্তিতে) নতুন হওয়ায় ওইরূপ উদাহরণ দেয়া বেশ কঠিন ছিল।" গুপ্তচরবৃত্তির উদাহরণ টানা একজন প্রশিক্ষকের কাছে খুবই প্রিয়, কারণ এটা শুধু শুনতে ভলো লাগে তাই নয় বরং এ ধরণের বিভিন্ন কাহিনী পার্থিব 'এসপায়োনজ' বিষয়াবলীর মধ্যে আনন্দদানেও সক্ষম।

ঙ। মনভোলানো কথার মায়াজাল (Pep talk)

'র' প্রশিক্ষণ স্কুলে আলোচিত (Pep talk) 'মনভোলানো কথামালা' অন্যান্য প্রশিক্ষণ স্কুলে আলোচিত কথামালার (Pep talk) অনুরূপ। এ সব শুরু করা হয় নতুন রিক্রুটদের কল্পজগতের গুপ্তচরবৃত্তির কল্পকাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাস্তব 'ইন্টেলিজেন্স' ও 'এসপায়োনজ' জগত সম্পর্কে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য। একইভাবে এ সব বর্ণনা এক সপ্তাহ থেকে দশদিন পর্যন্ত চলে। একজন প্রশিক্ষক এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন, "একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উদাহরণ যা কোর্সের শুরুতে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে, সুইজারল্যান্ডে বসবাসকালীন একজন তরুণ গোয়েন্দা এজেন্ট মধ্যস্থতাকারী এক ব্যক্তির মাধ্যমে একজন বিদঘুটে সাংবাদিকের সাথে কিছুক্ষণ 'গালগল্প' বা আড্ডা মারার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন; সেই 'চরম রাজনৈতিক মতাবলম্বী' সাংবাদিকের বিশেষভাবে উল্লেখ্য করার মতো 'কোদাল সদৃশ' দাড়ি ও 'তীক্ষ্ণভেদী' একজোড়া চোখ ছিল। কোনো

কারণে এজেন্ট ভদ্রলোক সময় করে উঠতে পারেননি এবং অবশেষে সেই সাংবাদিক রাশিয়ায় সংঘটিত বিপ্লবে অংশ নিতে সুইজারল্যান্ড ত্যাগ করেন। তাঁর নাম ছিল 'নিকোলাই লেনিন' ও এজেন্ট ভদ্রলোক ছিলেন 'এলেন ডুলেস'।" এই এলেন ডুলেস পরবর্তীতে আমেরিকার সি আইএ'র গঠনে স্থপতির ভূমিকা পালন করেন, যিনি প্রায়ই বলতেন যে, "তুমি কখনই জানো না কখন বা কোথায় বজ্রপাত আঘাত হানবে।" (যদিও এলেন ডুলেস প্রকৃতার্থে একজন এজেন্ট ছিলেন না তবে তিনি ছিলেন একজন 'ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ')। উল্লেখ করা যায় যে সব গুপ্তচর ধরা পড়েছেন, তাদের উদাহরণ বা ঘটনা ব্যর্থতার সমার্থক/পরিচায়ক বলে প্রশিক্ষণ স্কুলে 'ভালো উদাহরণ' রূপে গণ্য করা হয় না।

একটি দেশের সার্থক গোয়েন্দা 'কেস স্টাডি' থেকে কতটুকু শেখা যায় তা বিতর্কের ব্যাপার। কারণ প্রত্যেকটি অপারেশন ভিন্ন প্রকৃতির এবং কার্যক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক বিবেচনায় উভয় পর্যায়েই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং পরিস্থিতিতে অপারেশন পরিচালিত হয়ে থাকে।

দুটো ঘটনা ও অপারেশন কখনো একরকম নয়। কারণ প্রত্যেকটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ভিন্ন সংস্কৃতির আলোকে অপারেটরদের নিজস্ব রুচি ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পরিচালনা করতে হয়। বড়জোড় এ সব ক্ষেত্রে 'এসপায়োনজ' কার্যক্রমের 'অনুভূতি' প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ভিন্ন স্থানে একইরূপ পরিস্থিতির জন্য কোনো নির্দিষ্ট 'কার্য সাধন প্রণালী' নির্দেশ করা সম্ভব নয় এবং সেখানে অন্যরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা যেমন সি আইএ, কেজিবি, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস, এমনকি পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিও সাধারণত অনুরূপ ভিন্ন পটভূমি ও শিক্ষায় গড়ে উঠেছে। তাদের 'লক্ষ্য' ও 'উদ্দেশ্য' ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার মধ্যে তারা তাদের কাজ চালিয়ে যায়। তাদের কর্মক্ষেত্রে একমাত্র মৌলিক সাদৃশ্য হচ্ছে যে, তারা সকলেই 'ইন্টেলিজেন্স'-এর জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত।

চ। প্রশিক্ষণের প্রবহমানতা (The Training Continues)

বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স থেকে ধার করা আপ্তবাক্যসমূহ 'র'-এর প্রশিক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ এর কিছু অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আর বাকিটা 'ভালো উদ্ধৃতিরূপেই' উল্লিখিত হয়, যেমন- "একটি উৎকৃষ্ট এসপায়োনজ অপারেশন একটি উৎকৃষ্ট বিয়ের মতো,"। "এটা কোনো ঘটনাই নয়, এখানে কোনো ভালো গল্প হতে পারে না।"

এরমধ্যে নতুন প্রশিক্ষণার্থী মাত্র দশদিনের সীমিত সময় পার করার পর আসল গোয়েন্দাবৃত্তির যৎসামান্য প্রক্রিয়া রপ্ত করতে পারে, যা দ্বারা সে দেশের 'বন্ধু' ও 'শত্রু'র মধ্যে পার্থক্য করার কৌশল সম্পর্কে অবগত হয়। সে আরো বুঝতে পারে যে, একটি গোয়েন্দা সংস্থা মূলত: শত্রু থেকে বন্ধুর পার্থক্য নির্ণয় করে না, বরং দেশের পররাষ্ট্রনীতি সে কাজটি সঠিকভাবে সমাধা করে থাকে।

পরবর্তী কোর্সে তাকে বিভিন্ন নিত্য কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত করা হয়, যেখানে সে বিভিন্ন দাপ্তরিক ফর্ম (Forms), তথ্য শ্রেণীবিন্যাস এবং বিভিন্ন দপ্তর ও আন্তঃদপ্তর লিপি, 'অপভাষা' সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ সমস্ত একঘেঁয়ে ব্যস্ততা থেকে আপাত কোনো মুক্তি নেই। কিন্তু এ পর্যায়েই সে ক্ষণস্থায়ী কোনো ঘটনা বা দ্রুত শোনা কোনো কথা থেকে 'কি ঘটতে যাচ্ছে' তা অনুভব করতে পারে যা পরবর্তী 'বিশেষ প্রশিক্ষণের' সাথে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে পর্যায়ক্রমে সে প্রথমবারের মতো দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে 'লাল ফিতার' বাধা অতিক্রম করার কৌশল তার করায়ত্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণে, প্রশিক্ষণার্থীকে সুদূর সীমান্ত এলাকায় পাঠানো হয়, যেখানে একজন 'সেল অফিসারের' সাথে এফ আই বি'তে (Field Intelligence Bureau) তাঁকে সংযুক্ত করা হয়। এফ আই বি'তে তাকে ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত সংযুক্ত থাকতে হতে পারে। এখানেই সে প্রথমবারের মতো 'অফিস অব স্পেশাল অপারেশনস' (OSO)-এর অধীনে পরিচালিত বিপদসংকুল স্থানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কোনো গোপন (Clandestine) অপারেশনের গুরুত্ব বুঝতে শিখে। 'রাত্রিকালীন মহড়ায়' তাঁরা সীমান্ত প্রহরা এড়িয়ে কাঁটাতারের বেড়ার নিচ দিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার মহড়া দেয়। সীমান্ত প্রহরীর দায়িত্ব পালনকারী 'স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো' (SSB) নামের আরেকটি গোপন গোয়েন্দা শাখার সদস্যদের সাথে পুরোপুরি বাস্তব অবস্থার আলোকেই এ সব মহড়া পরিচালনা করা হয়। যদিও মহড়াকালীন তাদের 'সীমান্ত প্রহরীদের' হাতে ধরা না পড়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় কিন্তু অনভিজ্ঞ বলে প্রতিনিয়তই তারা ধরা পড়ে ও ব্যাপক 'নকল' (Simulated) জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়। (প্রকৃতপক্ষে Simulated Interrogation-এর আসল জিজ্ঞাসাবাদের সব মজাই পাওয়া যায়)। এ 'নকল জিজ্ঞাসাবাদ' প্রশিক্ষণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাধারণত ছোট শহর ও গ্রামের পাশে এ সব গুপ্তচর মহড়ার (Spy game) আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের পরবর্তী পর্যায়ে 'নকল শত্রু এলাকায়' প্রতিকূল পরিবেশে প্রশিক্ষণার্থীকে 'কন্টাক্ট'- এর সাথে যোগাযোগ করতে হয় (Contact বলতে গোয়েন্দাবৃত্তিতে নির্দিষ্ট কোনো লোক/ এজেন্ট বোঝায় যার মাধ্যমে শত্রু এলাকায় যোগাযোগ করা হয় তথ্য আদায় বা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানার জন্য)। এ ক্ষেত্রে তাঁরা (প্রশিক্ষণার্থীরা) 'নকল শত্রু এলাকা' পরিদর্শন/পরীক্ষা করে, একটি 'সেফ হাউস' (গোপনে দেখা করা বা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কোনো একটি বাড়ি/স্থাপন বা জায়গা ঠিক করতে হয়, এ জায়গাকেই Safe House বলে) খুঁজে বের করে এবং তাঁদের মিলিত হবার নির্দিষ্ট স্থান (Rendezvous = R.V) চিহ্নিত করে। এ ধরণের মহড়ায় অনেক সময় সন্দেহজনক ঘোরাফেরার কারণে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের ধরে পুলিশে সোপর্দ করার ঘটনা ঘটে, যেখানে পুলিশ তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে কিছুই জানে না। একবার নতুন রিক্রুটের এভাবে ধরা পড়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একজন প্রশিক্ষক উল্লেখ্য করেন, *"ওই সব এলকার জেলখানাগুলো না দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, ওগুলো কী*

ধরণের জঘন্য, আর একরাত ওখানে কাটানো দুঃস্বপ্ন বৈ কিছুই নয়। খুব কম লোকই জামিনে ছাড়া পাওয়ার আগে এ কষ্ট সহ্য করতে পারে।"

'নকল পরিস্থিতি'র প্রশিক্ষণ একজন রিক্রুটকে শত্রু এলাকায় কিভাবে কাজ করতে হয়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তোলে। সীমান্ত এলাকার প্রশিক্ষণ গোয়েন্দা কার্যক্রম সংক্রান্ত 'আসল অনুভূতির' প্রকাশ ঘটায়। ভারতের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত এ ধরণের বিশেষ অপারেশনে কোনো কৃত্রিমতা ছাড়াই প্রশিক্ষণের উপযুক্ত স্থান বলে চিহ্নিত। শহরে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পর্বতসঙ্কুল এলাকায় কাজ করার জন্য অতি উচ্চতায় ও হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলের বৃষ্টিস্নাত জঙ্গলেও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শেষ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়; শুধুমাত্র OSO-এর (Office of Special Ops) বিশেষ শাখায় যারা পরবর্তীতে কাজ করবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট। বিজন এলাকা ও শহরে ঘনিষ্ঠ তদারকিতে পরিচালিত প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরি করা হয় 'শেষ পর্যায়ের ঘষামাজার' (Final Polishing) জন্য। এ পর্যায় সাধারণত 'প্রভাবিতকরণ পর্যায়' নামেই অভিহিত, যাকে সোজা কথায় 'মগজ ধোলাইয়ের' সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এভাবে একজন রিক্রুটের প্রশিক্ষণ পর্যায় শেষ হয় বটে তবে একজন 'ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ' হিসেবে তাঁর নবযাত্রা এখান থেকেই শুরু।

'নবজীবনের' শুরুতে তাঁকে অবশ্য বিদেশে থাকাকালীন 'এজেন্ট' বা 'স্পাই' (গুপ্তচর) রিক্রুট করার কলা-কৌশলগুলো ভালোভাবে রপ্ত করতে হয়। একটি সুবিন্যস্ত, সুসংগঠিত গোয়েন্দা চক্রে একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের কাজ কারবার এতোই গতানুগতিক যে, সে সাধারণ জ্ঞান ও সহজ কর্মকুশলতা প্রয়োগে ওই ধরণের কার্যক্রম সহজেই চালিয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত এজেন্টকে কিছু মৌলিক কার্যপ্রণালী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেখানে তাকে (এজেন্টকে) নিরাপত্তাকর্মীদের পাতা ফাঁদ শনাক্তকরণ কৌশল, অনুসরণ এড়িয়ে নির্ধারিত 'Meeting place'-এ যাবার পদ্ধতি, 'Meeting Place' নির্বাচন ও শনাক্তকরণ করা এবং সে এলাকা নিরীক্ষণ মুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করা বা জরুরি অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যদি কোনো জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে পেশাদারি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেখানে কোনোভাবেই খামখেয়ালির সুযোগ নেই। আবার বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত কারণে একজন 'এজেন্টের' মাঝে অতিমাত্রায় পেশাদারি মনোভাব থাকা উচিত নয়। কারণ এ ধরণের 'অতি পেশাদারি' মনোভাব তার চালচলনে নির্দিষ্ট 'ছকের' প্রবর্তন ঘটায় যা সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। তাই একজন গুপ্তচর তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা পর্যন্ত তাকে 'ঢেকে' রাখাই শ্রেয়।

এসব কিছুর মধ্য দিয়ে এর মাঝে প্রশিক্ষণ ও প্রভাবিতকরণের (Indoctrination-বিশেষ মতোবাদে শিক্ষা দেয়া) কাজ সম্পন্ন করা হয়। অঙ্গীকারের প্রতি নিবেদনশীলতা ও খুঁটিনাটি ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণার্থীদের আশাব্যঞ্জক সাফল্য অর্জিত হতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে একজন 'র' প্রশিক্ষকের ভাষা হচ্ছে, "মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শেষে একজন প্রশিক্ষণার্থী নিজেকে অত্যন্ত 'দৃঢ়চেতা' বলে ভাবতে শেখে, আপনার সম্মুখে যখন তারা

উপস্থিত হবে, তখন তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও উদ্দেশ্য বিচারের জন্য তাদের চোখের দিকে চেয়ে দেখার কিছুই নেই, বরং অনিয়মিত চলনে রুক্ষ পদযুগলই আপনার আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য যথেষ্ট।"

ছ। নতুন ধারণা (New Concepts)

১৯৭০ সালের পর 'র'-এর নীতিমালা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। যদিও 'মৌলিক নীতিমালা' অপরিবর্তনীয় থাকে। 'নতুন দর্শনের' প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল সত্তর-এর দশকের প্রথম দিকে কোনো এক সময়। প্রাথমিক পর্যায়ে রিক্রুট করা বিভিন্ন পেশাজীবীর (বিশেষ করে পুলিশ ও আই বি-র কর্মকর্তা/কর্মচারী) পাশাপাশি পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণে উচ্চপদস্থ আই সি এস কর্মকর্তা, প্রশাসক ও 'বিশেষ টেকনিক্যাল পেশায়' (বিশেষ করে 'এভিয়েশন' ও 'ইলেক্ট্রনিক্স') দক্ষ ব্যক্তিদের 'র'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পেশাদার ব্যক্তিরা তাঁদের নিজস্ব পেশায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তবুও তাদের পেশা সম্পর্কে খুঁটিনাটি পুনরায় মনে করিয়ে দেয়া ও গোয়েন্দাবৃত্তিতে সজাগ করে তোলার জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সে তাঁদের গোয়েন্দা বৃত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। বিশেষ করে 'Need to know' (যার যতোটুকু জানা দরকার) নীতি এক্ষেত্রে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। নতুন কর্মকর্তাদের সাথে তাদের পূর্বেকার কর্মস্থলের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে ছিল কিছুটা 'সোজাসুজি' ও কিছুটা 'মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী সমান্তরাল' ধরণের। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার নির্যাস/উপাদান হচ্ছে 'সরাসরি' ধাঁচের সম্পর্ক। নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে সাংগঠনিক গঠন, পরিচালনা দক্ষতা ও নতুন নতুন ধারণার উদ্ভাবনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়, যা এতদিন অবহেলিত হয়ে আসছিল। এ ক্ষেত্রে তথ্য বিশ্লেষণ শুধু সদর দপ্তরের সরাসরি আওতায় রাখা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম মোটামুটি একই রকম থাকে।

এরপরও একজন বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গোয়েন্দা কাজে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার জন্য আরো কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়ে ও এভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স একটি অতি উঁচুমানের "বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি' ও 'লক্ষ্যাভিমুখী' কর্মসূচিতে উন্নীত হয়। অতঃপর একজন বৈদেশিক 'ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ' একজন 'ডেস্ক অফিসারের' সহকারীরূপে প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত একটি 'কম গুরুত্বপূর্ণ' ডেস্কে যোগদান করেন। ভারতের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক ও আচরণ বিভিন্ন ডেস্কের 'গুরুত্ব' নির্ধারণ করে। অন্য অপারেটিভরা মাঠপর্যায়ে 'সহকারী কেস অফিসার' হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। উভয়ক্ষেত্রেই নতুন অপারেটররা দু'বছর পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান।

জ। এসপায়োনেজ (Espionage)

সরাসরি মাঠপর্যায়ে নামার পর 'স্টেশন চিফের' নিয়ন্ত্রণাধীনে একজন 'অপারেটিভ'

গোয়েন্দা জগতে 'নাক গলানো' শুরু করে। সে সাধারণত কোনো দাপ্তরিক ছদ্মাবরণে বিশেষ করে দূতাবাসের আওতায় কোনো 'আড়াল' (Cover) নেয়ার চেষ্টা করে; আবার কখনো কখনো বিভিন্ন গোপন/গুপ্ত (Covert) পরিচয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। এ পর্যায়ে অবশ্য 'নিজস্ব লোকদের' পক্ষ থেকে তাঁকে তীব্র প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এ 'নিজস্ব লোকগুলো' হলো বৈদেশিক বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এরা প্রায়শই এক 'আজগুবী' কৌতুকের উল্লেখ্য করে থাকে, "একজন 'র'-এজেন্ট একজন বৈদেশিক দপ্তরের কর্মকর্তার সাথে করমর্দন করার পর, উভয়েই দ্রুত নিজ নিজ আঙ্গুল গুণে দেখেন যে, কোনটি খোয়া গেছে কিনা!" যদিও এ পর্যন্ত এ ধরণের কোনো খোয়া যাবার ঘটনা রেকর্ড করা হয়নি।

একজন অপারেটিভের মূল কাজ হলো বিভিন্ন সূত্র থেকে কাঁচা (Raw) তথ্য সংগ্রহ (পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, কূটনীতিকদের বিভিন্ন আড্ডা ও বিভিন্ন প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ) এবং বন্ধু দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। অবশ্য নিয়োজিত 'ইনফর্মার'-এর মাধ্যমেও তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। এভাবেই বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে সে প্রথমবারের মতো 'একটি' নির্দিষ্ট গোয়েন্দা 'অপারেশন' সংগঠিত করতে শেখে।

খ। কর্মধারা (The Functions)

অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার মত 'র'- অপারেটিভদের কর্মধারাও মোটামুটি একই রকম। পূর্বোল্লিখিত 'রেসিডেন্ট' (Resident) প্রথাগত ঐতিহ্যে ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রমের 'প্রধানতম খুঁটি' বিশেষ। যেখানে কোনো অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে তিনি সাধারণত তার পার্শ্ববর্তী কোনো দেশ থেকে তা নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন মিসরে কোনো অপারেশনের তত্ত্বাবধানের জন্য বৈরুত বা বাগদাদে তিনি অবস্থান করবেন। যে দেশে তিনি থাকেন, সেখানে তিনি বৈধ বাসিন্দা হিসেবেই থাকেন ও সে দেশের কোনো স্থানীয় আইন–কানুন ভঙ্গ করেন না। তিনি অবশ্যই অর্থনৈতিভাবে সচ্ছল, সমাজে সর্বজনস্বীকৃত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এবং অতি অবশ্যই একজন 'ভারতীয়'। কোনো প্রকারেই তিনি 'গুপ্ত' (Covert) বা 'প্রকাশ্য' (Overt) অপারেশনের সাথে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত হন না, কিন্তু মাঠপর্যায়ের সকল 'অপারেটর' ও 'এজেন্টদের' সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং 'কেস অফিসার' ও 'স্টেশন চিফ' বা স্থাপনা প্রধানের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ থাকে।

'কেস অফিসার', যিনি কোনো 'প্রজেক্টে' জড়িত তিনি সে ক্ষেত্রের সকল 'অপারেশনাল রেকর্ডপত্র' সংরক্ষণ ও সাথে সাথে শুধু 'সুনির্দিষ্ট' কোন অপারেশনের জন্য রিক্রুটমেন্টের ঝামেলা ও তৎসংক্রান্ত সাক্ষাৎ আলোচনার ব্যবস্থা করে চলমান অপারেশনের অগ্রগতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি মাঠপর্যায়ের 'অপারেটিভদের' সাথে সময় সময় সরাসরি বা 'প্রধান এজেন্টের' মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখেন (প্রধান এজেন্ট, যে দেশে অপারেশন চালানো হয়, সে দেশের নাগরিক ও রিক্রুট করা এজেন্টের সাথে

তাঁর বৈধ যোগাযোগ রক্ষার উপর থাকে)। মাঠ পর্যায়ের এজেন্টদের দায়িত্ব হচ্ছে 'কেস অফিসারের' জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা, যার মাধ্যমে তিনি অপারেশন সম্পর্কিত সর্বশেষ খবরাখবর পেতে পারেন। এ ধরণের প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্যই 'কেস অফিসার' 'প্রধান এজেন্টের' (Principal Agent) মাধ্যমে 'এজেন্ট' নিয়োগ করে থাকেন। একজন 'গুপ্তচর' এভাবেই বড়শিতে ধরা পড়ে। বাস্তবে, এ সকল এজেন্টই অপারেশনের সদস্য যাদের প্রকৃত 'গুপ্তচর' বলা যেতে পারে। এজেন্টরা যে দেশে অপারেশন পরিচালিত হয়, সে দেশেরই নাগরিক ও দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁরা গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। দেশের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতাই' (তা যে কোনো কারণেই হোক না কেন) এদের 'এজেন্ট' হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। একজন এজেন্টকে কখনো নিয়োগের সাথে সাথেই কাজে লাগানো হয়, আবার কখনো কখনো তাকে ভবিষ্যতের জন্য 'হিমাগারে' রেখে দেয়া হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে নির্দেশ দেন সাধারণত 'স্থাপনা প্রধান' (স্টেশন চিফ) বা সরাসরি 'র'-এর দিল্লিস্থ সদর দপ্তর। এ ধরণের এজেন্টদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ('কভার' সরে যাওয়ায়) অস্বীকার করা হয় বা ত্যাগ করা হয়; তবে যারা কূটনৈতিক আবরণে আবৃত থাকেন তারা সাধারণত 'অনাস্থাভাজন' বা 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তি হিসেবে ঘোষিত হন।

একজন 'রেসিডেন্ট', এজেন্ট ও কেস অফিসারের মধ্যে যোগাযোগের ফাঁকে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং কখনই এজেন্টের সাথে সরাসরি যোগাযোগে আসেন না। সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে তিনি নিরাপদে কলকাঠি নাড়েন এবং যদি কখনো অবস্থা বেগতিক বলে বিন্দুমাত্র আভাষ পাওয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁর সকল 'সম্পৃক্ততা' মুছে ফেলার (Cleaning up or Mop up) ব্যবস্থা থাকে। বিশেষ করে, অপারেশনসমূহের 'ধরণ-ধারণ' ও অগ্রাধিকার বিবেচনা করে 'রেসিডেন্ট' সাধারণত একটির বেশি অপারেশন তত্ত্বাবধান করেন না। কারণ যদি অপারেশন ভুল হয়ে যায় বা বাতিল করতে হয়, তবে যেন শুধু একটি বাতিল করে অন্যগুলোর গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়।

'পুরাতন পদ্ধতিতে' স্পাই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা বর্তমান বাস্তবতায় অপ্রয়োজনীয় ও 'অতীত দিনের স্মৃতি' (যদিও এখন পর্যন্ত কোনো কোনো এজেন্সি নাছোড়বান্দার মতো এ ধরণের নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে কাজ করে)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাধারণত এ ধরণের 'নেটওয়ার্ক' পদ্ধতিতে বৃটিশ ও জার্মান এজেন্টরা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত ছিল। পর্যায়ক্রমে এ পদ্ধতি উভয় দেশের প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে একজন এজেন্ট ধরা পড়লে পর্যায়ক্রমে অন্য এজেন্টরাও ধরা পড়ে। একজন গুপ্তচর ধরা পড়ার পর যখন তাকে কথা বলতে বাধ্য করা হয় তখন জনবল ও সম্পদ উভয় দিকেই অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্রম উন্নতিতে 'তৃতীয় মাত্রা পদ্ধতি' (কথা আদায়ের জন্য এক ধরণের নির্যাতন পদ্ধতি) ইতিহাসের বিষয়, বরং তার স্থলে 'ট্রুথ সিরাম' ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একজন এজেন্টের কাছ থেকে অতি সহজে বহু 'কথা' আদায় করা সম্ভব, যতোটা না অসম্ভব ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

'বলপ্রয়োগে' ও 'নির্যাতনের' মাধ্যমে একজন এজেন্টের কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। পদ্ধতির যদিও পরিবর্তন হয়েছে তবুও একজন এজেন্ট এখনও 'বন্দুকের নলের' সামনেই তার কাজ চালিয়ে যায়। সে যতো কম জানবে (Need to Know) অর্থাৎ যা জানার দরকার শুধু তা জানবে, তাতে তারও যেমন লাভ, তেমনি যে দেশ তাকে নিয়োগ করেছে সে দেশেরও তেমনি লাভ।

ঞ। কিংবদন্তি (Myths)

একজন গোয়েন্দা বা এজেন্ট জনগণের নিকট প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ করে 'গোয়েন্দা কল্পকাহিনী' ও 'গোয়েন্দা পেশার' বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বিকৃতরূপে চিহ্নিত হন। কারণ জনসমক্ষে তাঁকে গোয়েন্দা বা এজেন্ট বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় এবং তাঁর অপারেশনগুলোর রেকর্ড থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে। সে কল্পকাহিনীর একজন 'সুপার এজেন্ট' (James Bond) নয়, যে অনুমতিহীন, রোমাঞ্চপ্রিয়, অন্ধকারের নাম গোত্রহীন বাসিন্দা বলে প্রতিবিম্বিত। আসলে একজন ভালো এজেন্টের গুণাবলী মোটামুটি এর বিপরীত। তাঁর প্রধানতম গুণ হতে হবে তাঁর জন্য নির্ধারিত অপারেশন টার্গেটে অলক্ষ্যে, চিহ্নিত না হয়ে পৌঁছানোর ক্ষমতা, যা একজন এজেন্টের জন্য সাধারণত অত্যন্ত কঠিন ও জটিল কাজ। যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে নির্ধারিত অপারেশন টার্গেট সীমানায় পৌঁছতে সক্ষম ততোক্ষণ পর্যন্ত সে 'কোনো কাজের লোক' বলেই বিবেচিত হবে না।

এখানে প্রচলিত আরেকটি ধারণার উল্লেখ করতে হয়। আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে, একজন এজেন্ট যে দেশের জন্য কাজ করছে তাঁকে অবশ্যই সে দেশীয় নাগরিক হতে হবে, আসলে এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বৃত্তিতে বেশি বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এজেন্ট কোনো দেশের হোক না কেন তা কোন ব্যাপার নয়, যে বা যার প্রয়োজনীয় অপারেশনাল এরিয়ায় পৌঁছানোর ক্ষমতা আছে তাকেই মূলতঃ প্রাধান্য দেয়া হয়। (এখানে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ভারতীয় এসপায়োনজ অপরেটিভের পক্ষে কখনই পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনায় ঢুকে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়, কাজেই পারমাণবিক বোমার তথ্য সংগ্রহের জন্য ওই স্থাপনায় কর্মরত কোনো পাকিস্তানী বা অন্যদেশীয় ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হবে না।)

এই রূঢ় বাস্তবতা আবার অনেকের মনে 'ডাবল এজেন্ট' ভীতির জন্ম দেয়, (যে একত্রে দু'টি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির পক্ষে কাজ করে থাকে) যেখানে, সে একঢিলে দু'পাখি মারার তালে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত এ রকম হতে পারে, তবে বেশিরভাগ সময় সে অন্যপক্ষের কোনো কাজে লাগে না, কারণ যখনই একটি 'ইন্টেলিজেন্স' এজেন্সি একজন 'ডাবল এজেন্ট' নিয়োগ করে তখন থেকে তাঁকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকে বা এমনভাবে বিকৃত তথ্য সরবরাহ করে যা আসলের মতো মনে হলেও শত্রুপক্ষের কোনো কাজে লাগার উপযুক্ত নয়।

'এজেন্ট' ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন 'ফ্রিল্যান্স'ও গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত

হন। সদর দপ্তরের একজন 'কেস অফিসার' এ ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনি বিভিন্ন 'স্টেশন চিফ'দের আওতাধীন এলাকায় কাজ চালিয়ে যান, যেখানে স্টেশন চিফরা তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন না, তবে কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি 'স্টেশন চিফদের' জানানো হয়। তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ পরিধির এবং সাধারণত তিনি কোনো এজেন্ট নিয়োগ করেন না। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে তিনি তাও করে থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে তাঁর এজেন্টদের সাথে 'কাট আউট' (মধ্যস্থ ব্যক্তি) ব্যতীত সরাসরি যোগাযোগ থাকে। 'কেস অফিসার' তাঁর দেশ ত্যাগের পূর্বে তাঁকে খুঁটিনাটি সর্ববিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানদান করেন। যদিও তাঁর কার্যকলাপ গোপনীয় ও অবৈধ কিন্তু তাঁর পরিচয় বা আবরণ বৈধ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এখানে তিনি এমনভাবে বিদেশ পাড়ি দেন যেন তাঁর প্রয়োজনই তাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। বৈধ পরিচয়দানকারী যে কোনো একজন ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যেমন- একজন ছাত্র, পর্যটক, সাংবাদিক, বিমানের কর্মকর্তা/কর্মচারী, ব্যবসায়ী অথবা একজন শিল্পীও 'ফ্রিল্যান্স' হিসেবে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর কার্যকলাপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাধারণ বিশ্লেষণ, তথ্য নিরূপণ থেকে আরম্ভ করে 'বিশেষ লক্ষ্যে' পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে যেখানে তাঁর পেশাভিত্তিক পরিচয়ই তাঁকে 'বিশেষ লক্ষ্যে' পৌছুতে ও তথ্য আদায়ে সহায়তা দান করে। তাঁর কার্যক্রম তাঁর পর্যায়ক্রমিক ভ্রমণের উপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়। সকল পর্যায়েই তিনি একজন 'অনুচর' হিসেবে পর্যাপ্ত সম্মানী পেয়ে থাকেন যাতে করে সংস্থার সাথে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন থাকে এবং কেস অফিসারের নিকট তিনি আসল নামে পরিচিত হন। তবে রেকর্ড পত্রে তিনি সাংকেতিক নামে নথিভুক্ত থাকেন।

এসপায়োনজের ক্ষেত্রে সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করে 'উদ্বুদ্ধকরণের' সার্থকতার ওপর। এখানে উদ্দেশ্যের তারতম্য থাকতে পারে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে, কেন একজন লোক গুপ্তচর হতে আগ্রহ প্রকাশ করে? এর উত্তরে বলা যায়, কেউ অতিমাত্রায় দেশপ্রেম বোধের কারণে, কেউ রোমাঞ্চের আশায়, আবার কেউ শুধু টাকার আশায় এ জগতে পা বাড়ায়; অবশ্য এ তিন শ্রেণী ছাড়াও আর একদল যারা এসপায়োনজকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে ইচ্ছুক তারাও গুপ্তচরবৃত্তির খাতায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। তবে সব ক্ষেত্রেই 'উদ্বুদ্ধকরণের' ব্যাপারটি সম্পর্কিত থাকে। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক তাঁর সাধারণ মানের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই একজন গুপ্তচর হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে পারেন। যদিও তাঁর কার্যকলাপ একজন নিয়োজিত ও প্রশিক্ষিত গুপ্তচরের চেয়ে সীমিত পর্যায়ে আবর্তিত হবে। একজন 'নিয়মিত' এজেন্টই কেবল গুপ্তচরবৃত্তির কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন, এ ধরণের গুপ্তচরদের কখনও কোনো ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে জানানো হয় না। কারণ এ জগতে সব কার্যকলাপ পরিচালিত হয় 'যার যতোটুকু জানা প্রয়োজন' (Need to know basis) শুধু ততোটুকু ব্যাপারে মাথা ঘামানোর ওপর কঠোর নীতিমালার মাধ্যমে। পৃথক পৃথকভাবে কঠোর নিয়মনীতিতে বিভক্ত বিভিন্ন বিভাগ শুধু তাদের যতোটুকু জানা প্রয়োজন, ততোটুকুই আলাদাভাবে জানতে পারে। অন্য বিভাগে কি তথ্য এলো না এলো তা নিয়ে মাথা

ঘামানোর কোন অধিকারই তাদের নেই। এই 'যার যতোটুকু জানা প্রয়োজন' কেবল মাঠপর্যায়ের অপারেটরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং 'র'-এর সমগ্র সংগঠনের, এমনকি প্রধানতম ব্যক্তির জন্যও একান্ত পালনীয় কর্তব্য।

একজন নিয়মিত অপারেটিভ যিনি সাধারণত পরবর্তীতে একজন 'কেস অফিসার' পদে উন্নীত হন, তাঁকে সবসময়ই কোনো 'কাল্পনিক মতোবাদে' উদ্বুদ্ধ এজেন্টের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকার উপদেশ দেয়া হয়। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এসব এজেন্ট কোন অপারেশনের মাঝ পর্যায়ে হঠাৎ 'বিবেকের' (!) দংশনে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে অঘটন ঘটিয়ে বসেন ও এ ধরণের অপারেশনকে 'চরম অনৈতিক' বলে ভাবতে শুরু করেন। সাধারণত কোনো আবেগাশ্রিত মতোবাদে বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তিই মূলত: একজন আদর্শ এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত হন। এজেন্ট রিক্রুটমেন্টের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে– এজেন্টের প্রদেয় তথ্য নয় বরং এজেন্টকে স্বয়ং কিনে ফেলা বা বশ করা এবং যতো কম পারিশ্রমিকই হোক না কেন তা নিয়মিত তাঁকে প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে তার পারিশ্রমিক নিয়মিত দেয়া তাঁকে একবারে বেশি টাকা দেয়া অপেক্ষা জরুরি, কারণ এ পদ্ধতি তাকে অপারেটিভের ওপর ক্রমঃনির্ভরশীল হতে বাধ্য করে।

কোনো কোনো সময় অপারেশনের বিশেষ পর্যায়ে কোনো বিশেষ বা নির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের জন্য এজেন্ট বেশি টাকা বা বোনাস দাবি করার প্রলোভনে পড়ে যায়। এ সব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের মতে অতিরিক্ত কোন দাবি না মানাই শ্রেয়। কারণ একবার দাবি মানলে তা ক্রমাগত ভুল তথ্য সরবরাহ করে এজেন্টকে অতিরিক্ত লোভী করে তুলতে উৎসাহিত করে। যদি দাবি আদায় না হওয়ায় এজেন্ট পিছিয়ে যেতে চায় তবে সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকরা অপারেটিভদের তাদের শিখানো মৌলিক নীতি অনুসরণের উপদেশ দিয়ে থাকেন। যেখানে উল্লেখ আছে, "এজেন্ট তোমার মাধ্যমে নিয়োগ লাভ করেছে, তার আর অন্য কোনো কন্টাক্ট নেই এবং তোমার কাছে তথ্য নিয়ে আসা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথও নেই। সে কিছুক্ষণ বা কিছুদিন মনে মনে রাগ করে থাকতে পারে কিন্তু অবশেষে সে অবশ্যই তোমার সাথে একমত হতে বা পথে আসতে বাধ্য।"

তথ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের ব্যাপারটি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ 'মূল্য প্রদান' কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট করা হয়। যাকে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হবে তার পূর্বতন সব তথ্য অবশ্যই তার আসল নিয়োগকর্তার (যেখানে সে কর্মরত থাকে) নিকট মজুদ আছে। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাকে এমনভাবে একটি যুক্তিযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হয় যাতে কেউ মনে না করতে পারে, সে তার আসল উপার্জনের বাইরে কোনো 'গোপন উপার্জন' করছে যা তাঁকে তার প্রতিষ্ঠানে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করবে। তাকে নিয়োগ করার মূল কারণ হলো তার গুরুত্বপূর্ণ কর্মস্থল যার তথ্য অপারেটিভের প্রয়োজন। যতো বেশিদিন নিরাপদে বিশ্বস্ততার সাথে সে ওই প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারে ততই তথ্য আদায় করা সুবিধাজনক। তাই গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাকে দেয় পারিশ্রমিক তাকে তার মূল উপার্জনের 'অতিরিক্ত কিছু দেয়ার' মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যভাবে ব্ল্যাকমেইলিং ও ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে তথ্য আদায় বর্তমানে প্রচলিত নয় (অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ প্রয়োজনে তা মাঝে মাঝে করতে হয়)। খুব কম এজেন্সিই এ নীতি অবলম্বন করে থাকে। আবশ্য এটা ভাবা উচিত নয় যে, তারা (এজেন্সি) হঠাৎ করে নীতি বা নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছে; বরং এ পদ্ধতি অপারেশনের পরবর্তী পর্যায়ে কোনো কাজে আসে না। এজেন্ট বা তথ্যসূত্রকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করলে হয়ত ভয়ে বা বিদ্বেষ বশে এজেন্ট তার কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যাবে– যা শেষ পর্যন্ত একটি মূল্যবান সূত্র বা উপায় হারানো ছাড়া আর কোনো উপকারে আসবে না। অবশ্য এমন উদাহরণও আছে যেখানে ভীতি প্রদর্শনে ভালো কাজ হয়েছে। অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বিভিন্ন সময়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। *সি আই এ, কে জি বি ও এস আই এস (বৃটিশি গুপ্তচর সংস্থা) পতিতালয় পরিচালনায় বিনিয়োগ করে থাকে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।* এ সব প্রতিষ্ঠান প্রতিপালনের উদ্দেশ্য কিন্তু একজন ভাবী এজেন্টের নিকট হতে কোনো পতিতা বা সমকামী ব্যক্তির সাহচর্যে থাকা অবস্থায় কোনো তথ্য আদায়ের জন্য নয়। সকলে সহজেই বুঝতে পারেন, ওইরূপ চরম মুহূর্তে কারো কোনো রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়ার মতো অবস্থা থাকে না। কিন্তু এ সব 'কীর্তিকলাপ' তাদের বেশি করে সহযোগিতা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কারণ তাদের এ সব 'বিশেষ' অবস্থার দৃশ্যাবলী বাইরে জনসমক্ষে প্রকাশ করার ভয় দেখানো হয়। এ সব ক্ষেত্রে একজন 'টোপ' সাধারণত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, একজন এমপিও কোনো কোনো সময় একজন মন্ত্রীও হতে পারেন যাঁরা গোপনীয়তা ফাঁস হবার ভয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে বাধ্য হন।

'র'-এর অবশ্য এ ধরণের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই (যদিও অনেকেই এ ধরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আগ্রহান্বিত ছিলেন)। তারা একবার পতিতালয় পরিচালনার দোষে অভিযুক্তও হয়েছিলেন। আমি (লেখক) বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে, এ ধরণের কোনো প্রতিষ্ঠান 'র'-এর নেই, কারণ পতিতালয় প্রতিষ্ঠা করলে শেষে কোনো এক সময় তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং বাইরে বিশেষ করে সংসদে এ নিয়ে বিরূপ আলোচনার ঝড় বয়ে যাবে।

যে সব দেশে 'সেক্স পারলার' বৈধ বলে স্বীকৃত সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও ভ্রমণকারী সরকারি কর্মকর্তাদের তাঁদের ভ্রমণ বিধিমালায় ওই সব পারলার এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেয়া হয়। তাই কোনো হদ্দ বোকা ছাড়া এ ধরণের প্রলোভনে কেউ নিজেকে জড়ায় না। কিন্তু তারপরও দুয়েকজন 'বোকা' (!) সব ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

'গুপ্তচর' বা 'এজেন্ট' যে নামেই তাদের ডাকা হোক না কেন, এসপায়োনজ জগতে তারা শুধু অর্ধেক ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অন্য একজন 'কন্টাক্ট' থাকেন যিনি বাকি অর্ধেক ভূমিকা সুচারুরূপে পালন করেন। এই বাকি অর্ধেক ভূমিকায় অভিনয়কারী হলেন একজন 'উচুঁ স্তরের কন্টাক্ট' (Contact)। এ সব ক্ষেত্রে স্থাপনা প্রধান (Station Chief) একটি অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে বাধ্য হন। 'কন্টাক্ট' হয়তো

কোনো বিশেষ ব্যাপারে আলোচনা করতে বা তথ্য দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু এ সব কিছুর সমন্বয় কার্যত নির্ভর করে মিশন প্রধানের সদিচ্ছার ওপর। অনেক দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাজক বা পুরোহিত শ্রেণীও ইন্টেলিজেন্সে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। 'র' প্রথমদিকে সার্বিক ক্ষেত্রে অনেক অপারেশনে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতীয় পররাষ্ট্র ক্যাডারের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী যাদের 'র' অপারেটিভদের সাথে ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার কথা, সেখানে 'র' অপাটিভরা সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির শিকার হন। এখন পর্যন্ত (১৯৮১ সাল পর্যন্ত) 'র'-এর কর্মকর্তাদের সাথে পররাষ্ট্র সার্ভিসের কর্মকর্তারা বিভিন্ন বিবাদে ও মতদ্বৈততায় জড়িয়ে আছেন। অবশ্য প্রথমদিকে এমনও দেখা যেত যে, রাষ্ট্রদূতগণের সাথে 'র'-এর স্থাপনা প্রধানদের বেশ ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেটা আজ 'ইতিহাসের' কথা। এ ধরণের সমন্বয়হীনতার অভাব অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় পররাষ্ট্র সার্ভিসের এবং আরো নির্দিষ্ট করে বললে বিশেষভাবে কূটনীতিবিদরা সরাসরি জড়িত না হয়েও এসপায়োনজ-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ কেবল দূতাবাসের মাধ্যমেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব, যদিও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিও এ ব্যাপারে আলাদাভাবে তৎপর থাকে। এটা কোনো নতুন মতোবাদ বা তত্ত্ব নয়, বিভিন্ন সংস্থাই (গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান) দূতাবাসের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কন্টাক্টের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ বজায় রাখে। দূতাবাস সহজেই যে প্রতিষ্ঠান বা তথ্যসূত্রের নিষিদ্ধ দরজায় করাঘাত করতে পারে তা অন্যভাবে অন্য কারো পক্ষে অত্যন্ত কঠিন একটি ব্যাপার বৈকি।

ট। তথ্য পাচার (Passing Information)

একজন এজেন্ট নিয়োগের পর প্রধান এজেন্ট ও তার মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বেশিরভাগ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এ সব ব্যাপারে একজন সংবাদ বাহক যাকে সাধারণত 'কাট আউট' (Cut Out) বলা হয় তার সাহায্যে রেসিডেন্ট এজেন্ট বা কেস অফিসার ও এজেন্টের মধ্যে তথ্য/সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকে। কোনো কোনো সময় তারা প্রয়োজনে 'ডেড লেটার বক্স' (Dead Letter Box) ব্যবহার করে (পূর্ব চিহ্নিত কোন নিরাপদ জায়গা যেখানে নিরাপদে কোন নথিপত্র রেখে আসা হয় ও পরবর্তীতে তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে)। ডেড লেটার বক্স-এর জন্য নিরাপদ উপযুক্ত এলাকা নির্ধারণ নির্ভর করে বিরাজমান পরিস্থিতির ওপর। কার্যত সে এলাকাকেই নিরাপদ বলে ধরা হয় যেখানে 'কাট আউট' জানতে পারে না যে, সে কি নথিপত্র বা তথ্য গ্রহণ করছে এবং এজেন্টকে চিহ্নিত করার তার কোনো উপায় থাকে না। 'ডেড লেটার বক্স' হিসেবে যে কোনো ধরণের স্থান যেমন– ট্রেনের নির্দিষ্ট কোনো বগি বা স্থান, বিমানের টয়লেট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিপণন কেন্দ্র, ট্রাভেল এজেন্সি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

যা হোক না কেন, বেশিরভাগ প্রশিক্ষক প্রতিনিয়ত একজন ভালো উন্নতমান সম্পন্ন এজেন্ট প্রাপ্তির ও এজেন্ট তৈরির উন্নত কলা-কৌশল উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করেন,

যদিও অনেক ক্ষেত্রে এ সব কিছুই ঠিকমত কাজ করে না। মূল নীতিমালা সব সময় সবক্ষেত্রে একই থাকে অর্থাৎ প্রতিটি এজেন্ট ও প্রতিটি টার্গেট থাকে ভিন্ন ভিন্ন। একজন প্রশিক্ষকের ভাষায়, "এসপায়োনজের সাথে অতিঘনিষ্ঠ একজনও এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারেন যে, পৃথিবীজুড়ে প্রায় সকল এসপায়োনজ সংগঠনে প্রায় একইরূপ পন্থা অনুসরণ করা হয়, যদিও কে জি বি ও জাপানের সংগঠনে এখনো সেই পুরানো পদ্ধতি অর্থাৎ নেটওয়ার্ক পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা বিদ্যমান।" পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সের ভারতে পরিচালিত বিভিন্ন অপারেশনে প্রায়ই দেখা গেছে যে, তারা খুব বেশি মাত্রায় মাঝে মাঝেই পুরনো নেটওয়ার্ক পন্থার অনুসরণ করেছে। "কিন্তু এ সকল প্রচেষ্টার প্রায় সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাই নির্দিষ্ট করে কোনো উপসংহারে আসা সহজ কাজ নয়" বলে 'র' প্রশিক্ষকদের ধারণা।

'টার্গেট' বলে ইন্টেলিজেন্সে যা চিহ্নিত করা হয়, তা ছোট কিংবা বড় মাত্রার যে কোনো অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিবেচ্য হিসেবে স্বীকৃত। অপারেশনের ক্ষেত্রে এটা নির্দিষ্ট দেশে নির্দিষ্ট তথ্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রে সরাসরি টার্গেট এ ব্যাপারে জড়িত নাও থাকতে পারে (পাকিস্তান কিভাবে পারমাণবিক বোমার প্ল্যান হস্তগত করলো তা জানার জন্য যে ইউরোপীয় ফার্ম/প্রতিষ্ঠান থেকে তা সংগ্রহ করা হয়েছে তৎসম্পর্কীয় তথ্য জানাই যথেষ্ট, সেখানে পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্পে যাবার প্রয়োজন নাও পড়তে পারে)। আবার টার্গেট, একটি গোটা দেশও হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ অপারেশনের কথা বলাই যথেষ্ট। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপক/বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চল, যেমন বর্তমানে (১৯৮১ সাল) অতি পরিচিত ইরান-ইরাক যুদ্ধ এলাকাও এর অন্তর্গত হতে পারে। আবার একটি ফাইল কেবিনেট, ব্যবহৃত/পরিত্যক্ত টাইপ রাইটার রিবন, কার্বন পেপার অর্থাৎ যেখানে বা যা দ্বারা গোপন কিছু সংরক্ষণ করা হয় বা লেখা হয় এমন সাধারণ বস্তুও 'টার্গেট' বলে চিহ্নিত হতে পারে। (তাই এ সব উপকরণ বিশেষ করে কার্বন পেপার ও টাইপ রাইটার রিবন বেশিরভাগ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে ব্যবহারের পরপর নষ্ট করে ফেলা হয়)। জনশ্রুতি বা প্রচলিত বিশ্বাসের আলোকে একটি মানবহৃদয় কখনই টার্গেট হতে পারে না, কারণ 'টার্গেট' হৃদয়ভিত্তিক হওয়ার চেয়ে শারীরিক হওয়াই বাস্তবসম্মত।

একবার টার্গেট চিহ্নিত করার পর, একজন অপারেটিভের ব্যাপক দায়িত্ব হচ্ছে সে সম্পর্কে সকল 'অপারেশনাল ডাটা' সংগ্রহ করা। এই 'ডাটা' সংগ্রহ একজনের বিস্তৃত 'অপারেশনাল পরিকল্পনা' প্রণয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত।

অপারেশনাল উপাত্ত সংগ্রহের শুরুতেই হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন তৈরি তথ্য, যেমন কোনো টার্গেট এরিয়ায় কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়। এ কাজটি বেশিরভাগ দেশের প্রচলিত সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাঝে সংগ্রহ করা তুলনামূলক সহজ কাজ। এ ধরণের নামের তালিকা সাধারণত বিভিন্ন সরকারি সংস্থার 'সীমিত' শ্রেণীভিত্তিক টেলিফোন নির্দেশিকায় পাওয়া যেতে পারে (বেসরকারি শিল্প-কারখানা ও

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাতেও অনুরূপ পাওয়া যেতে পারে)। এ সব টেলিফোন নির্দেশিকায় শুধু নাম নয় বরং পদবি, আবাসিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, সংস্থার ব্যবহৃত কোড বা সাংকেতিক শব্দ, অফিসে নির্দিষ্ট কর্মকর্তার নির্ধারিত রুম নম্বরও পাওয়া যায়। এই জাতীয় সংগৃহীত উপাত্তসমূহ 'টার্গেট সাবজেক্ট' (Target Subject) -এর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। 'টার্গেট সাবজেক্ট' বলতে সাধারণত কোনো একক ব্যক্তি বা একদল নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়ে থাকে, যার বা যাদের টার্গেট এলাকায় প্রবেশাধিকার এবং ঈপ্সিত তথ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে। *প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার পর 'সাবজেক্ট' নিয়মিত বিভিন্ন ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ধর্মীয় সমাবেশ, এমনকি বেশ্যালয়েও কখনো কখনো যাতায়াত আরম্ভ করেন। কিছু কিছু ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাছে সদ্য নবায়িত পতিতালয়, মেসেজ পারলার, হেলথ ক্লাবের তালিকা তৈরি থাকে যেখানে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি পদস্থ ব্যক্তিত্ব ও এমপিরা নিয়মিত যাতায়াত করে থাকেন।* এ ধরণের তালিকার ব্যাপারটি ব্যাপকার্থে বেশিরভাগ পশ্চিমা ও কিছু কিছু পূর্বাঞ্চলের দেশের জন্য প্রযোজ্য। এভাবে বিভিন্ন স্থানে সাবজেক্টের যাতায়াতের উদ্দেশ্য হলো টার্গেট এলাকার তথ্যে যাদের আইনসম্মত হস্তক্ষেপের অধিকার আছে তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। ভারতে সি আই এ ও কে জি বি উভয় এজেন্সির অপারেটিভদের প্রতিশ্রুতিশীল সরকারি ও ব্যবসায়ী 'সাবজেক্টের' সাথে প্রায়ই 'আড্ডা' দিতে লক্ষ্য করা যায়, যার ফলশ্রুতিতে তারা কোনো প্রাথমিক বা চলতি ঘটমান ঘটনার সূত্র পেতে পারে।

যদিও প্রতিটি এজেন্সিরই আলাদা নিজস্ব পদ্ধতি আছে এবং এ ক্ষেত্রে সি আই এ ও কে জি বি'র উল্লেখ্য করা মানে এই নয় যে, ভারতে অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোও তাদের মতো একইরূপ কোনো পন্থা অবলম্বন করে না। এখানে ওই দুটি বিশেষ এজেন্সির উল্লেখ্য করার অর্থ হচ্ছে যে, ওই দুটো এজেন্সির 'কার্যকলাপ' এ এলাকায় তাদের বৃহত্তর স্বার্থে নিবেদিত। সি আই এ ভারতে জানামতে কয়েকবার চেষ্টা করেছে (অনেকবার সফলও হয়েছে) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা বা ব্যক্তিত্বের সাথে সখ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে। এ ধরণের প্রথম শ্রেণীর 'টোপের' মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত গোপনীয় সেক্রেটারি, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যক্তিত্ব; অর্থাৎ যারা প্রায়ই মন্ত্রী বা সেক্রেটারিগণের সাথে বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে মিলিত হয়ে থাকেন তাদের বোঝানো হয়।

অন্যদিকে কে জি বি দ্বিতীয় শ্রেণীর 'টোপের' ওপর নির্ভর করে এসেছে। যাদের মধ্যে ক্লার্ক, টাইপিস্ট, সংবাদবাহক শ্রেণীর লোকজন অন্তর্ভুক্ত (যারা সাধারণত গোপনীয় ও সাধারণ সব ধরণের তথ্যই বহন করে ও অফিস সময়ের পর কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে অফিসে থাকতে পারে বা প্রবেশ করতে পারে)।

তৃতীয় ধারার 'টোপের' মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ান, টেলিফোন অপারেটর, রাজমিস্ত্রি, পানি লাইন তদারককারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যারা শুধু কোনো অকস্মাৎ পাওয়া সুযোগে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। (উপরোল্লেখিত বিশ্লেষণ, বিভিন্ন সময় সি

আই এ; কে জি বি ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর নিয়োজিত বিভিন্ন ধৃত গুপ্তচরদের স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রদত্ত। এ রকম অনেক ক্ষেত্রে দৃত গুপ্তচরেরা এমনকি জানতো না যে, তারা কার পক্ষে কাজ করছে)। এ সব বিভিন্ন 'টোপ' ছাড়াও অন্য আরেক ধরণের আকর্ষণীয় তথ্যসূত্রের উল্লেখ্য করা যায়, যারা বৈদেশিক নিযুক্তি লাভ করেন ও প্রায়ই এখান থেকে ওখানে বদলি হয়ে যান। এ শ্রেণীর মধ্যে কূটনীতিবিদ হতে শুরু করে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত কূটনীতিবিদ নন এমন কর্মকর্তাও থাকেন, যারা তাদের স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের হয়ে সমন্বয় সাধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। এঁরা প্রায়শই অত্যন্ত আকর্ষণীয় তথ্যসূত্র হিসেবে গণ্য হন, কারণ তাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় সরকারি দলিল দস্তাবেজ নাড়াচাড়া করেন, যা যে কোনো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির নিকট অত্যন্ত কার্যকর 'তথ্যসূত্র' রূপে তাঁদের চিহ্নিত করে।

মহিলাগণ যারা একসময় 'রীতিগত কারণে নিষিদ্ধ' বলে বিবেচিত হতেন, তাঁরা, এমনকি ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভদের স্ত্রীগণ অনেকদিন থেকে এসপায়োনজ জগতের বাইরে অবস্থান করে আসছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে, যখন দেখা যায় যে, 'স্বামীরা' বিভিন্ন 'কভারে' ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মনামে গোয়েন্দা বৃত্তিতে নিয়োজিত আছেন, তখন 'স্ত্রীদেরও' এসপায়োনজের অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা হয়। তাই বর্তমানে বেশিরভাগ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে 'স্বামী-স্ত্রী দল' হিসেবে একটি দলীয় পদক্ষেপ বেশ কার্যকর বলে স্বীকৃত।

সঠিক 'তথ্যসূত্রের' সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা আসলে তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়, যদি 'টার্গেটের' সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে সঠিকভাবে জড়িয়ে পড়া যায়। এই সামাজিক পরিমন্ডলে যুক্ত হওয়ার জন্য অপারেটিভকে ক্লাব, ধর্মীয় সংগঠন ও ক্রীড়া ক্লাবে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অপারেটিভের গৃহীত কৌশল হলো কারো মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না করে ওইসব সংগঠনের সাথে পুরোপুরি 'মিশে যাওয়া'। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, একজন 'তথ্যসূত্র' চিহ্নিত করার পূর্বে অনেক ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই জটিল পরিস্থিতিতেই অপারেশনের সবচেয়ে কঠিন অংশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হয়।

বেশিরভাগ দেশে অবশ্য এ ধরণের কাজ তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার নয়, কারণ ওই সব দেশের রাজধানীতে ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহরে সামাজিক পরিমন্ডলের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত। তার উপর কূটনীতিবিদগণ ও সরকারি কর্মকর্তারা খুব বেশিমাত্রায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে থাকেন, যা এ ক্ষেত্রে কাজের জটিলতাকে অনেক সহজ করে আনে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ ব্যাপারটি আসলেই বেশ কঠিন। কারণ, তাদের সামাজিক বিন্যাসই এ রকম যে, নিরাপত্তা এজেন্সিগুলো সব সময় সম্ভাব্য 'তথ্যসূত্রের' ওপর কড়া নজর রাখে। কিন্তু একজন প্রশিক্ষকের মতে "এসপায়োনেজ জগতে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়"। যে সব দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল, সে দেশের বিভিন্ন সাংবাদিক, ছাত্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল ওইসব দেশে প্রায়ই শুভেচ্ছা সফরে যাতায়াত করে, যার

দরুণ একজন 'কন্টাক্ট' খুঁজে পেতে বিশেষ কষ্ট হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটি হচ্ছে, কেবল একজন সঠিক 'কন্টাক্ট' খুঁজে বের করা।

একজন প্রতিশ্রুতিশীল এজেন্ট খুঁজে পেয়েও তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার পর 'তার' সম্পর্কে 'জ্ঞাত হওয়ার' Feel, যে অভিধায় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে এই 'জ্ঞাত হওয়া'-কে বোঝানো হয়) সমস্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রাথমিক তদন্তের সময় এ 'জ্ঞাত হওয়ার' ব্যাপারটি ভিন্ন ভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়, কারণ ওই প্রতিশ্রুতিশীল এজেন্টটি একজন সঠিক নির্বাচিত ব্যক্তি নাও হতে পারেন। তবে একবার যখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এজেন্টটি একজন খাঁটি ব্যক্তি তখন তদন্তের পরিবর্তে তাকে কোনো নির্দিষ্ট 'অফার' দেয়া হয়। এরপরও কোনো ভুল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো ভুল 'অফার' একটি অত্যন্ত বড় বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। প্রায় প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিশীল এজেন্ট কোনো 'অফারের' পরে তার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে এবং তথ্য প্রদান ও সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব বলয়ের ওপর নির্ভরশীল থাকতে চায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো এজেন্ট তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রস্তাবে রাজি হন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার জন্য কোন 'ছল' বা 'excuse'-এর নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। কারণ তিনি মানসিকভাবে কাজ করতে প্রস্তুত হলেও যে কোনো 'ছল' বা 'excuse'-এর আশ্রয় তাকে নিতে হয় এবং তা তাকে তার বিবেকের কাছে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে।

একবার প্রস্তাব গ্রহণের পর নব্য প্রতিশ্রুতিশীল এজেন্টকে স্বল্প গুরুত্বের তথ্য সংগ্রহের জন্য টোপে গাঁথা হয় (অবশ্য এজেন্ট পরম নিশ্চিন্তে এ 'টোপ' সম্পর্কে অনবহিত থাকেন)। একবার সাফল্যের সাথে তথ্য সংগ্রহের পর 'নব্য এজেন্ট' তার নতুন কাজের প্রতি আস্থা লাভ করেন এবং বিবেকের সাথে তার যুদ্ধের ইতি ঘটে। তিনি ক্রমান্বয়ে বুঝতে শেখেন যে, তাঁকে যা করতে বলা হচ্ছে তা অত্যন্ত সহজ কাজ বৈ কিছু নয়।

'অগোপনীয়' তথ্য সংগ্রহের পর ধীরে ধীরে নতুন এজেন্টকে ক্রমান্বয়ে 'মোটামুটি গোপনীয়' ও 'অতিগোপনীয়' শ্রেণীর তথ্যসংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা হয়। প্রতিক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য পর্যাপ্ত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।

(আমি এ ক্ষেত্রে কয়েক বছর পূর্বে 'র' প্রধান মিঃ কাও-এর সাথে আমার সাক্ষাতের ঘটনা স্মরণ করতে পারি, যেখানে আমি তাঁকে 'র'-এর বিপুল অংকের বাজেট ও এর যথেচ্ছ খরচ করবার অনুমতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। যদিও মিঃ কাও 'র'-এর বাজেট সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তিনি উল্লেখ্য করেন যে, "আপনি যদি সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি কিনতে চান, তবে আপনাকে অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হবে, তথ্যের ব্যাপারেও সে কথাই প্রযোজ্য")।

ইতোমধ্যে নব প্রতিশ্রুতিশীল এজেন্ট একজন পূর্ণাঙ্গ গুপ্তচরে পরিণত হন। এ পর্যায়ে এজেন্টের সাথে নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়, যেখানে পূর্বে তাঁকে তাঁর চিন্তা-চেতনার ওপর শ্রদ্ধাশীল থেকে কাজ করতে দেয়া হতো সেখানে এই প্রথমবারের মতো তাঁকে

নির্দিষ্ট 'শ্রেণীভুক্ত', 'অতিগোপনীয়' তথ্য সংগ্রহের জন্য বলা হয়। অবশ্য পাশাপাশি প্রথমবারের মতো তাঁকে 'ফাঁকি' দিয়ে লুকিয়ে কাজ সমাধা করার বিভিন্ন কলা-কৌশল শিখিয়ে দেয়া হয়, যেখানে এতোদিন পর্যন্ত তিনি তার নিজ বুদ্ধিমত্তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। এ সব কলা-কৌশল শিখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি 'অতিগোপনীয়' তথ্যসমূহ দেখার ও জানার অধিকার আছে তিনি অতি অবশ্যই তাঁর নিজ দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সার্বক্ষণিক নজরদারিতে আবদ্ধ থাকেন। অনেক দেশেই, যে সব ব্যক্তির 'গোপনীয়' ফাইলপত্র ঘাঁটার সুযোগ আছে, যা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেখানে নিজস্ব লোকদেরও চোখে চোখে রাখতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এজেন্সি একটি বিশেষ 'ছক' অনুযায়ী নজর রাখার ব্যবস্থা করে যাতে ওই ধরণের ব্যক্তিদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক রুটিন নিয়মিত চেক করা হয়। (ভারতীয় ব্যবস্থাদিও অনেকটা অনুরূপ। সি আই ডি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো যৌথভাবে ওই দায়িত্ব পালন করে থাকে।)

পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পদ্ধতিগত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে এ সব ক্ষেত্রে আদর্শ পরিস্থিতি হচ্ছে ডকুমেন্ট বা দলিলপত্রাদির নকল করা। এ ক্ষেত্রে অবশ্য নকলকারী প্রাপ্ত দলিলপত্রাদি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু কোনো এজেন্টের পক্ষে ক্যামেরাসহ দলিলপত্রাদির সংরক্ষণাগারে প্রবেশ করে তার ফটো তুলে আনা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এভাবে ছবি তোলা হয়তো কোনো ব্যতিক্রমী পরিবেশ পরিস্থিতিতে একবার সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এভাবে ছবি তোলার পুনরায় কোনো প্রচেষ্টা এজেন্টের চিহ্নিতকরণ ও তার ধরা পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এরপরও, বর্তমানে যুগে 'দ্রুতগতির ফিল্ম' ও উন্নত প্রযুক্তির 'ছোট ক্যামেরা' যা সাধারণ বাণিজ্যিক বিপনিগুলোতেও সব সময় পাওয়া যায়, সেগুলোর মাধ্যমে দলিলপত্রাদির ছবি তোলা অনেক সহজ কাজে পরিণত হয়েছে। দলিলপত্রাদির নকল কপি তৈরিতে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত (ফটোকপি করা হতে শুরু করে মাইক্রোফিল্মে রূপান্তর পর্যন্ত) এবং এ ক্ষেত্রে দলিলপত্র সংশ্লিষ্ট স্থাপনা হতে সরিয়ে ফেলতে হয়। তবে এজেন্টের যদি ওইসব দলিলপত্রের ব্যাপারে অধিকার থাকে ও সে ওগুলো সাথে করে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে কেবল তখনই সে নকল প্রস্তুতে হাত দেয়ার অধিকার রাখে, অন্যথায় নকল কপি তৈরি বাস্তবসম্মত নয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থাপনার টাইপিষ্ট অতিরিক্ত কার্বনকপি সাথে নিয়ে যেতে পারে। তবে বর্তমানে প্রায় সকল নিরাপত্তা সংস্থাই এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়ায় এভাবে কোনো দলিল পাচার কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার এ পদ্ধতিতে একজন মুদ্রাক্ষরিককে একটি কন্টাক্ট বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করায় এজেন্টের জন্য যে কোনো সময় 'নিরাপত্তা বিপর্যয়' ডেকে আনতে পারে। তাই এ পদ্ধতিতে অতি প্রয়োজনীয় না হলে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না।

একজন এজেন্ট 'নিরীক্ষণে' থাকবেন, এ কথা ধরে নিয়েও বলা যায় যে, (যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) কোনো সরকারের পক্ষেই শ্রেণীভুক্ত দলিলপত্র পর্যবেক্ষণকারী সকল

কর্মচারী, নিদেনপক্ষে সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গের প্রতি সার্বক্ষণিক নিরীক্ষণ চালানো অসম্ভব ব্যাপার। (কারণ তা করতে হলে একজন লোককে তার অগোচরে ২৪ ঘণ্টা নিরীক্ষণে রাখার জন্য কমপক্ষে ৫ জন পর্যবেক্ষক/নিরীক্ষক প্রয়োজন এবং এতগুলো নিরীক্ষক পোষা এক কথায় অসম্ভব)। এ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সরকার এ ধরণের দলিলপত্রে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 'অনস্পষ্ট' নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সে ধরণের কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন রুটিন ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে কোনো হেরফের সন্দেহের উদ্রেক করে। একটি নির্দিষ্ট পরিমন্ডলে জীবন-যাপনকারী বা অভ্যস্ত ব্যক্তির রুটিনে সামান্যতম পরিবর্তন যা তার সামাজিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা অতি সহজেই খুঁজে বের করা সম্ভব। সুতরাং প্রতিটি এজেন্টকে তাঁর স্বাভাবিক জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য আদেশ দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

এজেন্টের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিমন্ডলেও প্রয়োজনীয় কারো সাথে কন্টাক্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একজন পর্যবেক্ষণাধীন এজেন্টের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার উপায় বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেখানে পূর্বনির্ধারিত 'সেফ হাউস' বা 'সেফ জোনের' মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়; তবে এ সবকিছুই হতে হবে 'পূর্বনির্ধারিত'। যদি কখনো খুব কম সময়ের মধ্যে এজেন্টর সাথে দেখা করা জরুরি হয়ে পড়ে তবে পূর্বনির্ধারিত ছদ্মনামের আড়ালে একটি জায়গায় 'স্বল্পকালীন সাক্ষাতের' ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরণের 'স্বল্পকালীন সাক্ষাৎ' সাধারণত কোনো মেসেজ, বিশেষ করে কোনো 'নোট' যখন জনবহুল কোনো স্থান যেমনঃ সিনেমা হল, বাণিজ্য কেন্দ্র, হোটেলের টয়লেট বা থিয়েটারে অতিদ্রুত আদান-প্রদানের প্রয়োজন হয় তখন আয়োজিত হয়। অবশ্য এ সব পদ্ধতি হাজারো রকমের হতে পারে তবে সব কিছুই থাকে পূর্বনির্ধারিত। যদিও এভাবে যোগাযোগ করা একটি নিরাপদ ব্যাপার তবুও নিরীক্ষণাধীন কোনো এজেন্ট এ ধরণের যোগাযোগ স্থাপনের সময় ধরা পড়তে পারেন। আবার কোনো কোনো সময় অনির্ধারিত যোগাযোগের ব্যবস্থাও করতে হয়। এমনকি তিনি যদি সন্দেহের উর্ধ্বে থাকেন তবুও এজেন্টকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে যোগাযোগ করার নির্দেশ থাকে। অল্পসময়ের নোটিশে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে কোন 'সেফ হাউস' যা সাধারণত কোনো আবাসিক এলাকায়, যেখানে এজেন্ট গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার আগেও নিয়মিত যাতায়াত করতেন সেখানে সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়। অথবা এমন কোনো স্থান বেছে নেয়া হয় যেখানে এজেন্ট শহরের বাইরে কোনো পর্যটন প্রমোদ কেন্দ্রে কাজের অবসরে ক্ষণিক 'আরাম' উপভোগের জন্য যেতে পারেন। 'সেফ হাউস' পদ্ধতিতে সাধারণত অন্যান্য সকল উপায়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর্যায়ে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে যোগাযোগ করা হয়। ইন্টেলিজেন্স জগতে 'সেফ হাউস' মূলত হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য অথবা যদি পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে বা কাভার উন্মোচিত হয়ে যায় তখন যাতে কিছু সময়ের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক জেরার হাত থেকে বেঁচে লুকিয়ে থাকা যায় বা জেরার মুখে পড়লেও যাতে ওই এলাকাতে এজেন্টের উপস্থিতির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখানো সহজ হয় সেজন্য নির্বাচিত হয়। একজন এজেন্ট কেবল 'প্রতি নিরীক্ষণ' বা 'কাউন্টার সার্ভেইলেন্সে' উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভের পর 'সেফ হাউস' পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমতি লাভ

করে। অবশ্য এ প্রশিক্ষণও তাকে সার্বক্ষণিক এক মস্তবড় ঝুঁকির সম্মুখীন করে তোলে কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি নির্দিষ্ট এলাকায় তার উপস্থিতির সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হতে পারেন। এতোসব প্রশিক্ষণের পরও একজন ভালো উপযুক্ত 'নিরীক্ষণকারী' যে কোনো এজেন্টকে বিশেষ করে সন্দেহভাজন কোনো এজেন্টের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ও 'প্রমাণ উপাত্তের লেজের' সূত্র ধরে সহজেই শনাক্ত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে এজেন্ট নিজে তো বটেই বরং তার সহগামীসহ গ্রেপ্তার হবার ঝুঁকি থেকে যায়।

একবার যখন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তখন সদর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়া দুটি মৌলিক পদ্ধতিতে সাধিত হতে পারে। প্রথম পদ্ধতিতে এজেন্টের কাছ থেকে দলিলপত্রাদি সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেয়া হয়। যেখানে এগুলো পরবর্তী গন্তব্যে পৌছার জন্য রাখা হয় তাকে ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভরা 'ডেড লেটার ড্রপ' বলে থাকে। সাধারণত একজন 'বাহক'-এর মাধ্যমে এ সমস্ত দলিলপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করানো হয়। 'বাহক' কদাচিৎ কখনো কোনো অপারেশনের বিষয়বস্তু, ধরণ বা কোনো এজেন্ট ও অপারেটিভের পরিচয় জানতে পারে; তবে যে অপারেটিভ তাকে নিয়োগ করেছে তার সাথে তার পরিচয় থাকে এবং সে অপারেটিভ মাত্র দু'একবার বাহকের সাথে রুটিন ঠিক করার জন্য মিলিত হন ও যখন তখন ইচ্ছানুযায়ী তার (বাহক) সাথে যোগাযোগ স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান করেন। এভাবে বাহকের অপ্রয়োজনীয় সকলের সাথে যোগাযোগের সকল রাস্তা বন্ধ রাখা হয়।

'বাহক'- একজন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বিমান কর্মচারী বা এমন কোনো ব্যক্তি হতে পারেন যিনি সচরাচর স্বাভাবিক প্রয়োজনে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান যেখানে ওই সব ডকুমেন্টসমূহ পৌছানো প্রয়োজন। একজন 'বাহক' নিছক গোপন মিশনে ব্যাপৃত হওয়া থেকে আরম্ভ করে শুধু টাকা উপার্জনের জন্যও এ ধরণের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

বাহকের মাধ্যমে পরিবহনের পাশাপাশি পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ ডাক বিভাগের সাহায্যেও সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। যদিও অনেক সরকার চিঠিপত্র 'সেন্সর' করে থাকে তবুও প্রতিটি চিঠি খোলা ও পড়া এক কথায় অসাধ্য ব্যাপার। এমনকি যদি আপাতত নির্দোষ সহজ সরল শব্দমালার সাথে সাংকেতিক শব্দও মিশ্রিত থাকে তথাপি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যতীত তার অর্থ উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে একটি সাধারণ টেপরেকর্ডারে রেকর্ডকৃত মেসেজ যা একটি সংযুক্ত 'গ্যাজেট' (একপ্রকার সাইফার বা সাংকেতিক হিজিবিজি শব্দ বা পরিবর্তিত বেতার তরঙ্গকে স্বাভাবিক পরিবর্তন করতে পারে এবং স্বাভাবিককে উল্টোটা করতে পারে)-এর মাধ্যমে পরিবর্তিত আকারে প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়। এই 'গ্যাজেটের' ব্যবহারের ফলে মেসেজটি অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে টেপ করা যায় যা ভুল গতিতে চলমান কোনো রেকর্ড প্লেয়ারের মতো শব্দ তৈরি করে বা কর্কশ শব্দের উৎপত্তি ঘটায় এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রেরিত হয়ে থাকে। রেকর্ডকৃত মেসেজটি একটি অ-ক্ষতিকর 'হামিং সাউন্ডের'

(রেডিও ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত) সাথে প্রেরণ করা হয়, যা অপর প্রান্তে একটি অনুরূপ গ্যাজেট-এর মাধ্যমে বেতার যন্ত্রে গৃহীত হয়। এভাবে রেকর্ডকৃত দশ মিনিটের কোনো মেসেজ আর 'কর্কশ শব্দ' ধাপ অতিক্রমে মাত্র দু'সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে থাকে। এমনকি যদি মাঝপথে কোথাও এ মেসেজটি মনিটর করা হয়, তবে তা নিতান্তই কোনো আবহাওয়া জগত সংক্রান্ত কর্কশ শব্দ বলেই মনে হবে। এ ধরণের বার্তা প্রেরণের জন্য দূতাবাসগুলোকে ব্যবহার করা হয়। কারণ তাদের সাধারণ দৈনন্দিন কাজের জন্য বৈধ বেতার যন্ত্রপাতি কূটনৈতিক আবরণে ব্যবহার করা যায়। *অন্য আরেক পদ্ধতিতে চোরাকারবারিদের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান বা পাচার করা হয়। চোরাচালানি তার স্বাভাবিক চোরাচালানের পাশাপাশি এসপায়োনজের সাথেও যুক্ত থাকেন*। এ পদ্ধতিকে সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। কারণ একজন চোরাচালানি যে কোনো সময় ধরা পড়তে পারে এবং বাঁচার জন্য এসপায়োনজের সাথে তার সম্পৃক্ততা প্রকাশ করে দিতে পারে যা যে কোনো সরকারের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর একটি ব্যাপার। এ পদ্ধতি, যে সব জায়গায় অন্যসব পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে কেবল সেখানেই ব্যবহার করা হয়।

ঠ। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স (Counter Intelligence)

এসপায়োনজ আইন-কানুন অনেকটা 'ক্রিমিনাল অ্যাক্টের' সমগোত্রীয় (যদিও যে দেশে গুপ্তচর পাঠানো হয় সে দেশে আইন-কানুন ভঙ্গ করেই তা করা হয়)। এসপায়োনজ জগতে কোনো কাজ তার ন্যূনতম চিহ্নও যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেভাবে সম্পাদন করা হয়, এমনকি যে দেশে এটা পরিচালনা করা হয় সে দেশের সরকার পর্যন্ত কোনো গোপন দলিল/ তথ্য চুরি যাওয়ার পরও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে। অবশ্য মাঝে মাঝে যখন কোন এজেন্ট ধরা পড়ে তখন এর ব্যতিক্রম হয়। যখন একজন এজেন্ট ধরা পড়ে তখন এর পশ্চাতে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অপারেটররা সক্রিয় বলে ধরে নেয়া যায়। ভারতের ক্ষেত্রে এ কাজটি করে থাকে আই বি বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো। বেশিরভাগ ইন্টেলিজেন্স সংস্থায় বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ও এসপায়োনজ ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার আওতাভুক্ত। যদিও ভারতে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স আই বি-র একটি অংশ তবুও 'র'-এর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও গোপন তথ্য পাচার বন্ধ রাখার জন্য 'র'-এ আলাদা একটি 'কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স' শাখা রয়েছে। অবশ্য একজন 'র' কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভের ভাষ্য মতে, 'র'-এর 'কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কোনো ক্ষমতা নেই', যা দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, আই বি-র মতো 'র'-কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সন্দেহজনক কাউকে গ্রেপ্তার ও অন্তরীন করার কোনো ক্ষমতা নেই। এ পর্যন্ত 'র'-এর অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য কোনো অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেনি। 'র'-কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সেল সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অনুসন্ধান, তল্লাশি ও সংস্থার সাধারণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সন্তুষ্ট হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

যাহোক না কেন, এরপরও বিদেশী সংবাদ সংস্থার মতে রবি নাথ সোনি নামে একজন 'র' কর্মকর্তা ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে দলত্যাগ করেছেন বলে সন্দেহ করা হয়। 'র'-এর সূত্র মতে, রবি নাথ সোনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন মেজর, যিনি

পর্যায়ক্রমে 'র'র সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৭০ সালে পাকিস্তান ডেস্কের অতিরিক্ত পরিচালকরূপে যোগ দেন। খবরে সোনিকে একজন সি আই এ'র অনুস্থাপনকারী বলে উল্লেখ করা হয়, যদিও 'র' এ খবরের সত্যতা অস্বীকার করে। এ সম্পর্কে যতোটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে, সোনি কিডনি অপারেশনের জন্য কানাডায় বদলি হবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এ বদলি কখনো বাস্তবে পরিণত হয়নি। সে সময় তাঁকে কিছুসংখ্যক বিদেশী মহিলার সাথে আড্ডা মারতে ও ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। কিন্তু ডেস্ক প্রধানের প্রশ্নের জবাবে সে কোনো বিদেশীর সাথে দেখা হবার কথা অস্বীকার করে (আই বি-র কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভরা এ ব্যাপারটি ডেস্ক প্রধানকে অবহিত করেন)। সরকারি আইনানুযায়ী কোনো ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ বিদেশীদের সাথে দেখা করলে তার বিশদ বর্ণনা লিখিতভাবে দিতে বাধ্য এবং বিশেষ করে কি কারণে তিনি বিদেশীদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে উৎসাহিত হয়েছেন তার উল্লেখ করতে হয়। যখন সোনিকে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেখানো হয় তখন সে ওইসব বিদেশিনীকে তাঁর শুধু বান্ধবী বলে উল্লেখ করেন। এর কিছুদিন পর সে কানাডায় ছুটিতে যাবার জন্য আবেদন করে, যা মঞ্জুর করা হয়। সোনি ছুটি পাবার সাথে সাথে কানাডায় চলে যান (যদিও তাঁর স্ত্রী ও সন্তান তাঁর আগেই কানাডায় চলে গিয়েছিলেন)। তাঁর ছুটি শেষ হয়ে যাবার পরও তিনি যখন অনুপস্থিত থাকেন তখন 'র' তাঁকে ফিরে এসে কাজে যোগদানের পরামর্শ প্রদান করে এবং এও উল্লেখ করে যে, তিনি যদি সময়মতো ফিরে না আসেন তবে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হবে। ধারণা করা হয়, কানাডীয় ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশ্যে সোনি স্থানীয় 'টরেন্টো স্টার' পত্রিকায় যোগাযোগ করে ও তাদের ওই চিঠিটি দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ওই পত্রে 'র' তাঁকে মেরে ফেলার ইঙ্গিত দিয়েছে। 'র'-এর সূত্র মতে কানাডীয় নাগরিকত্ব লাভের আশায় সোনি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য উক্ত 'নাটকের' অবতারণা ঘটান (এখনও সোনি কানাডায় আছেন বলে বিশ্বাস করা হয়)। 'র' তাঁর সম্পর্কে ওই বারই শেষ খবর নিয়েছিলে।

আই বি'র কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা খুব ভালোভাবেই ভারতে সক্রিয় রয়েছে, যেমন অন্যান্য দেশেও তারা সমানভাবে সক্রিয়। কোনো কোনো সময় তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারত, আবার অনেক ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ। পাকিস্তানের বর্তমান গোয়েন্দা কার্যক্রম বিশেষ করে ভারতের সামরিক অগ্রগতি ও স্থাপনা বলয়ে আবর্তিত। টিকা রামা কাসিয়াপের গ্রেপ্তার হওয়া, যিনি সামরিক কমান্ডারদের মিটিং-এর সারসংক্ষেপ পাকিস্তান দূতাবাসের আনোয়ার আহমেদ নামক একজন কর্মচারীর কাছে ৯ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে পাচার করেন তা অতিসাম্প্রতিক একটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আই বি এ সব গুপ্তচরদের 'গুপ্ত স্থান থেকে তাড়িয়ে বের করে' থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি অন্যান্য সংস্থার মতো একই রকম এবং অত্যন্ত সরল সাধারণ পদ্ধতিতে একজন গুপ্তচরকে ফাঁদে ফেলা হয়। এ ফাঁদ পাতার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু দলিলপত্র সংগ্রহের জন্য ফেলে রাখা হয়, যা একজন গুপ্তচরের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি ব্যাপার। এ সব দলিলপত্র সংগ্রহের পরপরই উক্ত গুপ্তচরকে শুধু নিরীক্ষণে রাখা হয় এবং শেষে কাসিয়াপের মতো গ্রেপ্তারের

মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। কাসিয়াপকে বেশ কিছুদিন ধরে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। কারণ তার অতিরিক্ত ব্যয় আই বি'র নজরে আসে। এরপর শুধু ধৈর্য ধরার ব্যাপার, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে তার কেস অফিসারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। অন্য আরেকটি ঘটনায় ইউ এন আই নামের এক সংবাদ সংস্থার সূত্রমতে পাকিস্তানী এসপায়োনজ কার্যক্রমে ৫২ জন ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীর জড়িত থাকার ঘটনা প্রকাশ পায়, যার মধ্যে ২৮ জন ছিলেন কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার। এ ঘটনার ফলশ্রুতিতে তিনজন পাকিস্তানী এজেন্ট ধরা পড়ে, যারা ভারতে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। যেহেতু এ কেসটি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব হয়নি। (অবশ্য এখন Samba Spying Case নামে আলাদা একটি বই বেরিয়েছে, যাতে ওই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়-অনুবাদক)। এখানে যে ব্যাপারটি লক্ষণীয়, তা হলো, পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স ধারণাতীতভাবে ভারতে সক্রিয়। এ ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে 'সাম্বা স্পাইং কেস' নামে সমধিক পরিচিত যা নিকটঅতীতে আই বি'র মাধ্যমে উন্মোচিত সবচেয়ে বড় মাপের একটি পাকিস্তানী গুপ্তচর কার্যক্রম বলে ধরা যায়। কে জি বি ও সি আই এ–এর ব্যাপারেও অনুরূপ গুপ্তচরবৃত্তির প্রমাণ আছে এবং তাদের কিছু এজেন্ট পূর্ববর্তী কয়েক বছরে ভারতে ধরাও পড়েছে।

ড। ভুল তথ্য উপস্থাপন (Disinformation)

'র'-এর গৃহিত কৌশল অথবা ব্যাপকার্থে ইন্টেলিজেন্স কৌশলের শেষ ধাপে এসে আমরা 'ফাঁকি দেয়া' বা 'ভুল তথ্য উপস্থাপন'-এ ধরণের ভিন্ন ভিন্ন অভিধায় ভূষিত বিভিন্ন সংস্থার প্রদত্ত বিশেষণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তবে যে বিশেষণেই ভূষিত করি না কেন সবার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, আর তা হলো 'ভুল পথে পরিচালিত করা', 'জনমতকে হতবুদ্ধি-বিশৃঙ্খল বা প্রজ্বলিত করা'।

যুদ্ধাবস্থায় এ সবের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের উপকারার্থে সামরিক উদ্দেশ্য হাসিল করা আর শান্তিকালীন সময়েও এগুলো দেশের স্বার্থের সাথে জড়িত। সোজা কথায় এর অর্থ হচ্ছে প্রবঞ্চনা বা চাতুরীর আশ্রয়ে কার্যসিদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে শত্রুদেশে ভুল তথ্যের অনুপ্রবেশ করানো হয়, যার ফলশ্রুতিতে সে দেশের স্বার্থহানি ঘটে থাকে। *এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুদেশের জনগণকে নিজ দেশের ইচ্ছানুযায়ী কোনো বিশেষ কিছুতে বিশ্বাস করানো। এ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভুল গোয়েন্দা রিপোর্ট সংবাদ মাধ্যম, কূটনৈতিক চ্যানেল অথবা রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্য পেশাজীবীদের মাধ্যমে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়, যাদের মতামত ভুলতথ্য পরিবেশনের সূত্র ধরে নিজ দেশের ইচ্ছানুযায়ী পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মতো প্রভাব বিস্তারকারী।*

ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ অপারেশনের' সময় অত্যন্ত কার্যকরি ফল পাওয়া গিয়েছিল। পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিসমূহ ধারণা করে, ভারতের দ্রুত ও পর্যাপ্ত সৈন্য সমাবেশের ক্ষমতা নেই। পশ্চিমাদের এ বিশ্লেষণ কায়দা করে পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সে প্রবিষ্ট করানো হয়। আসলে ভারতীয় সৈন্য উত্তর-পূর্বে সমাবেশ করেছিল। প্রস্তুতিপর্বে পশ্চাৎ অবস্থান থেকে আদিষ্ট জায়গায় সেনা চলাচলের অবস্থা বিরাজিত ছিল। এ কারণে

সেনাবাহিনী দূরে বিস্তৃত এলাকা যেমন ঝাঁসি, রাবিনা, হায়দরাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরে অবস্থান নেয়। সে সব স্থানে সঙ্কুচিত চলাচল অব্যাহত রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা হয়, কারণ একটি মাত্র শব্দের প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারত। পরিকল্পনাকারীরা ভারতের মতো একটি উন্মুক্ত দেশে কোনো গোপন তথ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না, বিশেষ করে ব্যাপক সৈন্য চলাচলের মতো উন্মুক্ত চলাচলে তা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তাঁরা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। ভারতীয় প্রতিরক্ষা অবস্থানসমূহ বিশেষ করে শেষ প্রান্তের রিজার্ভ সৈন্য সমাবেশ গোপন রাখার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীকে মহড়া স্থলে 'ভান' করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে একদম শেষ পর্যায়ে যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে তাদের অপারেশনাল অবস্থানে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এই প্রস্তাবনায় ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ রাজি হননি বরং তিনি উল্লেখ্য করেন, "আমি এ কল্পনাপ্রবণ খেয়ালি পরিকল্পনা মোটেই পছন্দ করছি না। আপনাদের এটা অবশ্যই বোঝা উচিত যে, আমার সেনা সংগঠন কোনো জার্মান প্যানথার ডিভিশন নয়। তাদের চলাচলে নিজেদের চাহিদামতো সময়ের প্রয়োজন আছে।"

অতএব তদনুযায়ী সেনাবাহিনীকে প্রকাশ্য দিবালোকে পুরোপুরি গোপনীয়তা ভঙ্গের ঝুঁকি নিয়েও শুধু সুষ্ঠু চলাচলের স্বার্থে 'কনসেনট্রেশন এলাকায়' পাঠিয়ে দেয়ার কাজ শুরু হয়। (কনসেনট্রেশন এলাকা বলতে যেখানে সেনাবাহিনী পুরোপুরি প্রতিরক্ষা অবস্থানে যাবার পূর্বে একত্রিত হয় তাকে বুঝায়)। অবশ্য তাদের প্রকৃত অবস্থানের কথা গোপন রাখার জন্য অন্য অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ছিল– যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে উদ্দেশ্যমূলক থামা, গুপ্ত পর্যবেক্ষকদের ফাঁকি দেয়ার জন্য অন্য ধরণের ভুল 'ফরমেশন সাইন' (কোনো ব্রিগেড বা ডিভিশনের সৈন্যরা আলাদাভাবে ব্রিগেড বা ডিভিশন অনুযায়ী ইউনিফর্মের হাতায় যে প্রতীক সংযুক্ত রাখে) এবং সম্পূর্ণ নতুন যুদ্ধ কৌশল সংক্রান্ত প্রতীক চিহ্নসমূহের ব্যবহার (India's war since Independence: The Liberation of Bangladesh, Vol II, Vikas, 1980)।

এ সব উদ্যোগ বেশ কিছুদিনের জন্য পর্যবেক্ষকদের বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছিল। এদিকে 'র' সূত্র থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন ভুল তথ্য উপস্থাপনের ফলে পশ্চিমা পর্যবেক্ষকরা সত্য বিবর্জিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা বেশকিছু সময়ের জন্য সৈন্য চলাচলের আসল খবর সংগ্রহে ব্যর্থ হয় যদিও শেষ দিকে এসে তারা সফলতা লাভ করে, কিন্তু ততোদিনে ভারতীয় উদ্দেশ্য সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

অন্যদিকে ভুল তথ্য পরিবেশনার ধারা অনুসরণ করে চীন পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের এ ধারণা দেয় যে, তারা সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে সংঘটিত মিসাইল পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেছে, অবশ্য 'র'–এর উল্টোই অনুমান করে।

এগুলোই মূলত কমবেশি ক্ষেত্রে প্রচলিত এসপায়োনজ ধারণা দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

চ। বিশেষ অপারেশনসমূহ (Special Operations)

এতোকিছুর পরেও 'র'–এর মধ্যে বিশেষ এসপায়োনজ সংগঠন সক্রিয়, যারা এসপায়োনজ ছাড়াও 'রাখঢাক ছদ্মাবরণে' যা সাধারণত প্রকাশ পায় না এমন 'প্রচুর নোংরা কাজে' ব্যস্ত থাকে। এরা 'অফিস অব স্পেশাল অপারেশন' (ও এস ও) –এর আওতাধীনে এদের কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। ও এস ও মূলতঃ এর নামের মতোই বিশেষ অপারেশন পরিচালনা করে। এ সংগঠনে যারা কাজ করেন তারা একেকজন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, যারা অপারেশনের ধরণের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। কোনো ইন্টেলিজেন্স তা সে বিশেষ বা অন্য যে কোনো ধরণেরই হোক না কেন তা মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া শুরু হতে পারে না। ও এস ও স্টাফরা প্রচলিত এসপায়োনজরই বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করেন। কিন্তু প্রচলিত এসপায়োনজ থেকে তাদের পরিচিতি প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং ঝুঁকিও অনেক ব্যাপক। ব্যর্থতা এক্ষেত্রে প্রচণ্ড হেনস্থার কারণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যদি অপারেশনের কথা জনগণের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। কিন্তু তবুও এ ঝুঁকি ও এস ও কে নিতেই হয়। তবে 'র' এ ক্ষেত্রে বেশ ভাগ্যবান, কারণ এর গৃহীত বাংলাদেশ ও সিকিম অপারেশন দুটো জনগণের কাছে কিছু কিছু প্রকাশ পেলেও এতে কোনো অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। এর মৌলিক কার্যক্রম আবর্তিত হয় সংস্থার বিভিন্ন সূত্র হতে যেমন– ছাত্র, ধর্মীয় গোষ্ঠী, শ্রমিক ও প্রবাসীদের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর, যা কিনা জনসচেতনতার প্রতিকূলে নয়। পরিকল্পনা, সংগঠন ও অপারেশনের যাত্রা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করার মাধ্যমে ও এস ও–এর কার্যক্রম চলতে থাকে। কোনো কোনো সময় দলত্যাগী কাউকে সমর্থন ও সাহায্য দান এবং সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে।

এ সব উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ও এস ও অপারেটররা বিভিন্ন কাভার নিয়ে, গোপন ছদ্ম উপায়ে নানা ধরণের সংস্থা গঠনে অথবা বিভিন্ন সংস্থাকে সাহায্য করে, যাদের শত্রু এলাকায় বৈধভাবে কাজ চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা নেই। এ সব কাভার গ্রহণের জন্য সাধারণত ট্রাভেল এজেন্সি, ছোটখাট রফতানি প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বেছে নেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই কাভারে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপারেশনের পরও যদি কাভার সন্দেহের উর্ধ্বে ও পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে তবে অপারেটিভরা ওখানে থেকে যায়। আবার যখন কোন দেশের সাথে রাজনৈতিক কোন আলোচনা ব্যর্থ হয় তখনও ও এস ও কে বিশেষ কাজে স্মরণ করা হয়। অবশ্য যখন যুদ্ধের ডামাঢোল বাজতে থাকে তখন ও এস ও কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। ও এস ও এমনিই একটি সংগঠন, যার কার্যাবলীকে বলা যায় 'গোপন বিশেষ অপারেশন, যা অন্যকিছু থেকে কম শয়তানীপূর্ণ। তবে অবশ্যই যুদ্ধ থেকে ভাল প্রকৃতির।'

অধ্যায় : ৫

রাখঢাক ছদ্মাবরণ
The Hush Hush Outfits

গুপ্তচর কার্যক্রমের আওতায় একমাত্র বিশেষ অপারেশন শাখা নিয়েই যে কদাচিৎ কখনো আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে তাই কেবল নয় বরং সংস্থার অন্যান্য সেকশন যেমন তথাকথিত 'চুপ-চাপ বা রাখঢাক সাজ সরঞ্জামাদির' সেকশন নিয়েও বিভিন্ন কথা শোনা যায়। অবশ্য এ সব সংস্থাকে ওইরূপ নামে অভিহিত করা হয় না বটে, তবে পাঠকের কাছে ওইসব নাম আসল উদ্দেশ্যটিকে পরিস্ফুট করে তোলে। 'র'-এর সংগঠন ও সাধারণ কার্যক্রম ইতোমধ্যেই 'রহস্যের দুর্জ্ঞেয় গহ্বরে' ঢাকা পড়ে আছে যা গড়পড়তা সাধারণ ভারতবাসীকে এর বিকৃত প্রতিবিম্বের ভেলকি দেখাতে ব্যস্ত। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখালেখি ও সাধারণ আলাপ-আলোচনা বা আড্ডা থেকেই এ ধরণের কথাবার্তা ছড়ায়।

প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে জানা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত 'র'-এর চিত্র যতদূর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার বাইরেও 'র'-এর মতো 'অত গোপনীয় নয়', এমন একটি সংস্থা (এ সম্পর্কে যথাস্থানে পূর্ণ আলোচনা করা হবে) যেমন 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র (AIR) সিমলায় অবস্থিত 'মনিটরিং সার্ভিস' আলোচনার দাবি রাখে। এ স্থাপনায় সকল উন্মুক্ত বেতার প্রচারণা মনিটর করা হয় এবং চাহিদানুযায়ী সে সব উপাত্ত যে কোনো সরকারি সংস্থা যার মধ্যে 'র' অন্তর্ভুক্ত, তাদের সরবরাহ করা হয়। মাঝে মাঝে প্রায়ই এ সংস্থা 'র'-এর বিশেষ বিশেষ দুঃসাহসিক কাজে সহযোগিতা করে থাকে। এ সহযোগিতাকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিদঘুটে বা অপ্রীতিকর বলে মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু এ ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা ইন্টেলিজেন্স জগতে নতুন কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ বি বি সি বা 'বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ মনিটরিং বিভাগ পৃথিবীব্যাপী বেতার প্রচরণা মনিটর প্রচেষ্টার একটি বহুজাতিক অংশমাত্র যা জনসাধারণ ও সংবাদসংস্থার জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত। ১৯৪৮ সালে সি আই এ'র সাথে সম্পাদিত এক চুক্তির আওতায় বি বি সি পৃথিবীর সব উল্লেখযোগ্য খবর ও বেতার প্রচারণা মনিটর করে আসছে। বি বি সি ও সি আই এ উভয়েরই গোপনীয়তার বিভিন্ন শ্রেণীভেদে বৈদেশিক স্থাপনাসহ একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক বিদ্যমান, যার মাধ্যমে তারা মৌলিক ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করে। বি বি সি কর্তৃপক্ষ এ ধরণের ছদ্মবিভাগের কথা জানুক বা না জানুক কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মনিটরিং কাজের জন্য এরূপ ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এ বিভাগটি অস্থায়ী রূপে গড়ে ওঠে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্বাহীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতিদ্রুত

এ সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটে। তারা নাৎসি প্রচারণা ও অন্যান্য সংবাদ সংস্থার প্রচারণা ও মনিটর করা আরম্ভ করে এবং এখনোও তা চালিয়ে যাচ্ছে (নাৎসি ছাড়া)।

দূতাবাস ও কনস্যুলেটের ভিতরের 'শ্রবণ কেন্দ্রের' (Listening Posts) ব্যবহার মনিটরিং বিভাগের কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল ব্যাপার যাদের অবস্থিতি কখনই যথাযথভাবে স্বীকার করা হয় না। ভারতে 'র'-সূত্রের দাবি অনুযায়ী 'এ ধরণের কার্যক্রম শুধু বি বি সি-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়'। বিভিন্ন দূতাবাসের ছাদে অবস্থিত নানা আকৃতির এন্টেনা তাদের নিজস্ব 'কীর্তি কাহিনী' বলার জন্য যথেষ্ট। যদিও দূতাবাসের স্বাভাবিক রুটিন অনুযায়ী বেতার বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণের বৈধ স্বীকৃতি বিদ্যমান তবুও বিভিন্ন সময় ওই সব বেতার নেটওয়ার্ক নানা প্রকার 'ছদ্ম গোপন' কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরপরও ওই সব নিত্য নৈমিত্তিকভাবে ব্যবহার করা হয় না, কারণ বেশিরভাগ দূতাবাস প্রধান এ ধরণের কাজকে ঘৃণার চোখে দেখেন।

ক। অল ইন্ডিয়া রেডিও (AIR)

যদিও অল ইন্ডিয়া রেডিও মনিটরিং সার্ভিস স্থাপনাসমূহ সরাসরি ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের সাথে জড়িত নয়, বা সি আই এ ও বি বি সি-র মতো কোনো চুক্তিতেও আবদ্ধ নয়, কিন্তু তারপরও প্রায়ই 'র' তাদের কাছে বিভিন্ন তথ্য চেয়ে পাঠায়। আকাশবাণীর মনিটরিং কেন্দ্রগুলো মনিটর করা বেতার প্রচারণা রেকর্ড করে রাখে। এ রেকর্ডগুলো প্রায়ই 'র' তাদের নিজস্ব কাজে ব্যবহার করে।

আকাশবাণীর নেটওয়ার্ককে বিভিন্ন সামরিক অপারেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'ঢাকা অভিযানের' সময় আকাশবাণীর মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা একটি সর্বোত্তম উদাহরণ, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, উন্মুক্ত প্রচার মাধ্যমও অত্যন্ত কার্যকরভাবে ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জেনারেল মানেকশ'র একটি ব্যক্তিগত বার্তা অবরুদ্ধ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল। অফিসার ও সৈনিকদের উদ্দেশ্যে পঠিত ওই বার্তায় বলা হয়, "আমি আপনাদের ইতোমধ্যেই দু'টো বার্তা পাঠিয়েছি। কিন্তু এ পর্যন্ত আপনাদের নিকট থেকে কোনোরূপ উত্তর পাইনি। আমি পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে, এরপর নতুন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে নির্বুদ্ধিতা এবং এর ফলশ্রুতিতে আপনার নেতৃত্বাধীন অনেক গরীব ও হতোদ্যম সৈনিকের অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।" এ বার্তার সাথে সাথে তাদের বেশি দেরি হবার পূর্বেই অস্ত্রসমর্পণের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সতর্ক করে বলা হয় "ভারতীয় বাহিনী আপনাদের চতুর্দিকে পৌঁছে গিয়েছে, আপনাদের বিমানবাহিনী বিধ্বস্ত। সমুদ্র দিয়েও আপনাদের কোনো আশা নেই। কেউ আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আপনাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে। মুক্তিবাহিনী ও জনগণ আপনাদের কৃত বর্বরতা ও পৈশাচিকতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। সুতরাং বৃথা জীবনহানি কেন? আপনারা কি বাড়ি ফিরে আপনাদের সন্তানদের সান্নিধ্য কামনা করেন

না? সময় নষ্ট করবেন না। একজন সৈনিকের নিকট অস্ত্রসমর্পণে লজ্জিত বা অপমানিত হবার কিছু নেই।" (The Liberation war of Bangladesh; Maj Gen Sukhwant Sing, Vikas)।

এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য উপলক্ষ্য যখন প্রচার যন্ত্রকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। আকাশবাণীর মনিটরিং সেল এখন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ভারতের স্বার্থের সাথে সরাসরি জড়িত যেমন মূলতঃ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন ও আফগানিস্তানের উন্মুক্ত বেতার প্রচারণা মনিটরিং করে থাকে। প্রচারযন্ত্রের চাতুরীপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই-এর উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশকে লক্ষ্য করে নানা তথ্য বিকীর্ণ করা। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্থির করা হয়েছে যে, প্রচার মাধ্যম সংবাদ, বিনোদন ও জ্ঞানদানের জন্য ব্যবহৃত হবে। তবে এটা সকলে ভালোভাবেই জানেন যে, প্রচারকার্যে নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভুল তথ্য অনুস্থাপন করা হয়ে থাকে। আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে প্রেসিডেন্ট বাবরাক কারমাল উত্তেজিত হয়ে বি বি সি'কে 'পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মিথ্যার যন্ত্র" বলে উল্লেখ করেছিলেন। রাশিয়ানদের আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের পর অনুষ্ঠিত প্রথম প্রেস কনফারেন্সে বাবরাক কারমাল ওই মন্তব্য করেন। এ ধরণের একটি মন্তব্যকে, কে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন তা নির্ভর করে তিনি কোন শিবিরে অবস্থান করছেন তার ওপর।

খ। রাখঢাক শাখা (Hush Hush Section)

ইলেকট্রনিক টেকনিক্যাল সেকশন (ETS) : 'ইলেক্ট্রনিক টেকনিক্যাল সেকশন'-'র' এর একটি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক শাখা যার কাজ হচ্ছে সামরিক বেতার সংকেত (যার বেশিরভাগ সাংকেতিক) মনিটর করা। অবশ্য ই টি এস-এর আসল কার্যক্রম প্রতিবেশী দেশসমূহ, বিশেষ করে যাদের কাজ কারবার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত, তাদের সামরিক বেতার সংকেত মনিটর করা ও সাংকেতিক বার্তা রহস্য উদ্ধারের (Decoding the message) সাথে সম্পর্কিত। এ সংগঠনকে তত্ত্বাবধান করার জন্য এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নিয়োজিত থাকেন যারা কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ চালিয়ে যান। বেসামরিক ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের সমম্বিত ও অতি উঁচুমানের এ দলটির কথা খুব কম আলোচিত হয়, এমনকি 'র'-সংগঠনেও এদের সম্পর্কে কদাচিৎ কখনো কিছু শোনা যায়।

এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার (ARC) : এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার বিমান চলাচল ও নভোশ্চরণ সম্পর্কিত একটি সংস্থা, যার কাজ অনেকটা ই টি এস-এর সমপর্যায়ের; কিন্তু এরপরও এ দুটোর মাঝে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। এর লক্ষ্য সামরিক প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ ভূমিতে বিভিন্ন চলাচল মনিটর করাই এ সংস্থার আসল কাজ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, যেরূপ ইউ-২ বিমান, ও (ইউ-২ বিমান মার্কিনিদের তৈরি যা রাশিয়ার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করা হয়েছিল) উপগ্রহের মাধ্যমে ভূমিতে পর্যবেক্ষণ

চালানো হয়, তদ্রূপ এ সংস্থাও অনেকটা সে ধরণের কাজ করে থাকে। এ আর সি সাধারণত বিমান থেকে পর্যবেক্ষণ, শত্রু এলাকার ফটো তোলা ও লজিস্টিক সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত কাজ করে।

ই টি এস ও এ আর সি সংস্থা দু'টোর জন্য 'র'-এর বাজেটের বৃহদাংশ ব্যবহার করা হয়। ইন্টেলিজেন্স জগতে এভাবে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা অবশ্যই একটি ভালো দিকনির্দেশনা দেয়।

গ। স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো (এস এস বি) বা বিশেষ কার্যক্রম বিভাগ : (Special Service Bureau)

১৯৬২ সালে চীনের সাথে যুদ্ধের পর পরই বিশেষ কার্যক্রম বিভাগ সৃষ্টি করা হয়, যা ছিল দেশের ভিতরে 'র'-এর একমাত্র সক্রিয় শাখা। এমনকি এ সংস্থা যখন এ ধরণের কাজে ব্যাপৃত ছিল তখনও যুদ্ধাকালীন সীমান্তের ওপারে এর (যুদ্ধ) প্রতিক্রিয়ার দিকেই লক্ষ্য রাখা হতো। এভাবে-এর কার্যক্রম ভারতের বাইরে কেন্দ্রীভূত হয়।

ভারতের চারপাশে সীমানাব্যাপী বিশেষ কার্যক্রম বিভাগের অপারেটিভরা সীমানাসংলগ্ন সীমান্তবাসীদের ছোটোখাটো যুদ্ধাস্ত্র ও যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি কোনো দেশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে যেন তারা নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং এর পাশাপাশি এস এস বি অপারেটরদের সাথে সীমান্ত অতিক্রম করে শত্রুর পশ্চাতে সক্রিয় থাকতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সীমান্তের জনগণের সীমানার ওপারের জনগণের সাথে শারীরিক ও অন্যান্য অভ্যাসগত সাদৃশ্য থাকায় প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ছদ্মবেশে গোপনে কাজ করা সহজতর হয়ে ওঠে।

এস এস বি; এ আর সি-র মতো 'মহাপরিচালক নিরাপত্তা'র নিয়ন্ত্রণে থাকে। অন্যদিকে ই টি এস অতিরিক্ত পরিচালকের আওতাধীন একটি বিভাগ। এ তিন শাখা আবার ঘুরে ফিরে 'র'-এর পরিচালকের কর্তৃত্বাধীন বলে বিবেচিত হয়।

ঘ। আড়িপাতা (Snooping On People)

'কাউন্টার এসপায়োনজ' কার্যক্রম ছাড়া ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো সাধারণত আড়িপাতার ব্যাপার-স্যাপার অস্বীকার করে থাকে। যদিও এ কাজের ভার দেশের মধ্যে 'র' এর ঘাড়ে বর্তায় না, তবে পৃথিবীর বড় রাজধানীগুলোয় 'র'-কে বাধ্য হয়ে এ ধরণের কাজে জড়িত হতে হয়।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সংখ্যা 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে' আর্ট বুকওয়াল্ড এ সম্পর্কে একটি চমৎকার কলাম লিখেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, জাতিসংঘের বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের উপর আড়িপাতা নিউইয়র্কে অবস্থিত অদৃশ্য এজেন্টদের জন্য একটি মানসম্পন্ন কাজ বলে বিবেচিত। জাতিসংঘে বিভিন্ন সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতগণের মর্যাদা নির্ভর করে,

আসলে কিভাবে ও কত অসুবিধার মধ্যে একজন বিদেশী এজেন্ট তাদের লক্ষ্য করে আড়িপাতা যন্ত্র রোপণ করবেন তার উপর। বৃহৎ শক্তিবর্গ যেমন- রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণচীন, জাপান, ফ্রান্স ও বৃটেনকে পাঁচটি আড়িপাতা তারার মূল্যমানে ওজন করা হয়। অন্যান্য পশ্চিমী ও পূর্ব ব্ল্যাকের রাষ্ট্রগুলো পায় চারটার সম্মান, তৃতীয় বিশ্বের যে সব দেশ তেলসমৃদ্ধ সেগুলো তিনটি ও তেলছাড়া দেশগুলো একটি বা কোনটি তারা ছাড়াও মূল্যায়িত হয়; অবশ্য তা নির্ভর করে তাদের সরকার প্রতিবেশীদের জন্য কেমন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে তার উপর। তবে এরও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়, যেমন- কিউবা। যদিও কিউবা একটি ক্ষুদ্রশক্তি বিশেষ তথাপি একে পাঁচটি তারা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। পাকিস্তান আণবিক প্রযুক্তির উন্নয়নের পূর্ব পর্যন্ত মাত্র ২টি তারার (!) সম্মানের অধিকারী ছিল।

নতুন দিল্লিতে 'আড়িপাতা'র পরিস্থিতি খুব একটা খারাপ নয়। যদিও ভারতীয়রা এ সব দৃশ্যের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে, কিন্তু রাশিয়ানরা এ ক্ষেত্রে বেশ সক্রিয় এবং তারা ধরা পড়লে ভারতের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। তবে আজ পর্যন্ত এ ধরণের ঘটনা ঘটেনি।

অধ্যায় : ৬

'অপারেশন বাংলাদেশ'

Special Operation : Bangladesh

এমন সময় আসে যখন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা একটি দেশের নিজস্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। এমনকি যে সব ঘটনার সাথে অল্পবিস্তর বা বহির্মুখী কোনো সম্পর্কই নেই তাও হঠাৎ করে ভীতিকর সমস্যা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরণের সমস্যাকে অন্যভাবে বিবেচনা করলে তা শেষ পর্যন্ত প্রলয় ডেকে আনে।

আবার এমন অবস্থাও হয় যখন এ সব পরিস্থিতিতে সরাসরি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় না, কারণ বিশ শতকের এ পৃথিবী 'সভ্য' বলেই বিবেচিত। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসাই একমাত্র সমাধান। যেহেতু প্রায়ই এ সব উদ্যোগ অবচলাবস্থায় পর্যবসিত হয়, তাই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর ঘাড়ে এসে বর্তায়। বাংলাদেশ হলো এ ধরণের একটি উদাহরণ।

সাধারণত এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ইতিবৃত্ত (বিদেশে পরিচালিত গোয়েন্দা কার্যক্রম) কখনই প্রকাশ করা হয় না। গোয়েন্দা কার্যক্রমের বিশেষ প্রকৃতির জন্য, গোপনীয় 'অপারেশন'সমূহ সব সময় গোয়েন্দা বিভাগে 'বিশেষ গোপনীয়' ব্যাপার হিসেবেই আবদ্ধ থাকে। যদি 'অপারেশন' ব্যর্থ হয় তবে-এর ফলাফল অপরিবর্তনীয়রূপে প্রকাশ করা হয় এবং এর সাফল্যে কদাচিৎ কোনো মন্তব্য করা হয়। বিশেষ করে জনগণ এ ব্যাপারে অন্ধকারেই থেকে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনগণকে এ সব 'অপারেশন' কি জন্য গৃহীত হলো তা জানানো মঙ্গলজনক। (বিশেষ করে যখন জনসাধারণ ভুল তথ্য ও বিরূপ প্রচারণায় বিভ্রান্ত থাকে)।

ক। বাংলাদেশ অপারেশন (The Bangladesh Operation)

বাংলাদেশ অপারেশন (বাংলাদেশে পরিচালিত 'র' কার্যক্রমের সার্বিক কোনো 'ছদ্মনাম' ছিল না তবে আংশিকভাবে কোনো কোনো খুচরো অপারেশনের 'কোড' বা 'ছদ্মনাম' ছিল) সম্ভবত মূল গোয়েন্দা কার্যক্রম শুরুর এক বছর পূর্বেই শুরু হয়। এমনকি মুক্তিবাহিনী গঠনের মাধ্যমে পৃথিবী যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা করছিল তখন পর্যন্ত অনেকেই বাংলাদেশে 'র'-এর গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। অবশ্য ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ অপারেশনের' প্রথম পর্যায়ের ইতি ঘটেছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তৈরি হয়ে বসে আছে।

বিদেশী পর্যবেক্ষকরা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর সাফল্যকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মান 'ব্লীৎস ক্রীগ' রণকৌশলের অভাবিত সাফল্যের সাথে তুলনা করেছেন। লন্ডনের 'সানডে টাইমস' পত্রিকা ১২ ডিসেম্বর '৭১ সংখ্যায় উল্লেখ করে যে, "ভারতীয় বাহিনী মাত্র ১২ দিনে প্রতিরোধ চূর্ণ করে ঢাকায় পৌঁছে, যা ১৯৪০ সালে ফ্রান্স দখলে জার্মান 'ব্লিৎস ক্রীগ' কৌশলের অতীত সাফল্য স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে রণকৌশল ছিল একই সাথে গতি, প্রচণ্ডতা ও নমনীয়তা (রণকৌশল পরিস্থিতি বুঝে যাতে পরিবর্তন করা যায়)"। আজ পর্যন্ত ধারণা করা হয়, ভারতীয় বাহিনী একাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যদিও এটা সত্য যে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা ও শৌর্যবীর্যের সাথে যুদ্ধ লড়েছে এবং ইতিহাসে খুব কমসংখ্যক সামরিক অভিযানই এরূপ বিস্ময় ও বিবেচনার দাবি রাখে, কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী ব্যতীত অন্য আরো অনেকে এ ক্ষেত্রে অমূল্য সহায়তা প্রদান করেছেন। শত্রু সীমানায় ও পশ্চাতে থেকে যারা যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে উপযুক্ত সম্মান তাদেরও প্রাপ্য এবং তারা ছিল 'র'-এর এজেন্ট ও 'মুক্তিবাহিনীর' দামাল সৈনিক।

'র' মুক্তিবাহিনীর সাথে একত্রে একটি ধ্বংসাত্মক বাহিনীতে পরিণত হয় এবং ভারতীয় বাহিনীকে তথ্য প্রদান আরম্ভ করে। পাকিস্তানী বাহিনীকে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাশ কাটিয়ে ত্বরিত অগ্রসর হবার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতর কৌশলে পরাজিত করা সে জন্যে সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রণাঙ্গনে জয়লাভ করার আগেই ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধ জয় করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সামরিক অভিযানের সাফল্যে অন্য অনেক বিষয়ই সহায়ক শক্তি হিসেবে অনুঘটকের কাজ করেছে, কিন্তু 'র' এর সমর্থন এক্ষেত্রে 'চূড়ান্ত তাৎপর্য' বহন করে।

খ। প্রারম্ভিক তথ্যাদি (Early Reports)

পাকিস্তানী চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে 'র'-এর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরুর এক বছর পূর্বেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। লন্ডনে গোয়েন্দা সংস্থার 'পররাষ্ট্র বিভাগে' কর্মরত একজন এজেন্ট পাকিস্তানী কূটনীতিকের মন্তব্য থেকে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হন। সেখানে পাকিস্তানী কূটনীতিক ইশারা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালি মুসলিমদের বিরুদ্ধে "ব্যবস্থা গ্রহণে মনস্থ করেছে", পাকিস্তানী কূটনীতিকের ভাষায় "ওই সব মূর্খ বাঙালিদের এমন শিক্ষা দেয়া হবে যা তারা সারাজীবনেও ভুলবে না।" এ ধরণের একটি মন্তব্য গোয়েন্দা এজেন্টের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হয় এবং সে অতিদ্রুত এ ব্যাপারটি দিল্লিকে অবহিত করে। গোয়েন্দা সদর দপ্তরের 'পাকিস্তান বিভাগে' পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে অন্যান্য আরো সংগৃহীত তথ্যে পাকিস্তানী কূটনীতিকের 'লন্ডন মন্তব্যের' সমর্থনে একটি পরিকল্পনার চিত্র ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এ সমস্ত গোয়েন্দা তথ্যাদি শীঘ্রই 'সংযুক্ত গোয়েন্দা কার্যনির্বাহী পরিষদে' পাঠানো হয়। অবশ্য সে সময় এ ধরণের পরিকল্পনার কথা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করা হয় এবং ব্যাপারটি সে মুহূর্তে ফেলে রাখা হয়।

গ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (Agartala Conspiracy Case)

পূর্ববর্তী ঘটনার সূত্র ধরে ঘটে যাওয়া একটির পর একটি (কোনোটি বড় মাপের ও কোনটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়) ঘটনাকে ক্রমানুযায়ী বিস্তারিত বর্ণনা করা কষ্টসাধ্য। শেষ পর্যন্ত 'র'-এর 'বাংলাদেশ অপারেশন' এ যুক্ত হবার জন্য ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর একটি পরিষ্কার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করতে হলে একজনকে অবশ্যই ১৯৬৮ সালে 'র'-এর জন্ম সালের পরপর ঘটে যাওয়া গোয়েন্দা কার্যাদির পর্যালোচনা করতে হবে। কিন্তু ততোদিনে ভারতীয় এজেন্টরা পূর্ব পাকিস্তানের 'মুজিবপন্থী' (Pro-Mujib) একটি অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আগরতলায় ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতীয় এজেন্ট ও 'মুজিবপন্থীদের' মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরবর্তী গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

কর্নেল 'মেনন' (Menon) যিনি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ও মুজিবপন্থী অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিলেন (আসলে কর্নেল মেনন ছিল শংকর নায়ারের গৃহীত ছদ্মনাম), তিনি আগরতলা বৈঠকের পর ইঙ্গিত পান যে, 'মুজিব পন্থী' গ্রুপ আন্দোলন শুরু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। 'কর্নেল মেনন' তাদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, তার মতে 'সঠিক ফলদায়ক সিদ্ধান্তে আসার সময় এখনো হয়নি।' এ ক্ষেত্রে তারা যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা অসম্পূর্ণ ও এভাবে কাজ না হবার সম্ভাবনাই বেশি। কর্নেল মেনন ঠিক কথাই বলেছিলেন- 'তারা অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে' এবং ঢাকাস্থ 'ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস' (এখানে আসলে হবে EPR বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-অনুবাদক) অস্ত্রাগারে হামলা চালায়, কিন্তু এ প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আসলে এ পদক্ষেপ একটি ধ্বংসাত্মক ফলাফল ডেকে আনে, ঠিক যেরূপ 'কর্নেল মেনন' ধারণা করেছিলেন। এর কয়েক মাস পর ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার চক্রান্ত করার জন্য ২৮ জন পাকিস্তানীর বিচার করা হবে। শেখ মুজিবকেও বারদিন পর একজন দোষী হিসেবে জড়িত করা হয়। এ মামলাই পরবর্তীতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে পরিচিতি পায়। অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে কামালউদ্দীন আহমেদের 'সত্য বলে উল্লেখ' করা স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে অভিযোগ গঠন করা হয়। পাকিস্তানী পত্রিকা 'ডন' (Dawn)-এ হাইকোর্টের বিচারকার্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে উল্লেখ করা হয়, ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে 'মেজর মেনন' ও 'কর্নেল ত্রিপাথী' নামের দু'জন ভারতীয় এজেন্টের যোগাযোগ ছিল। এটা নিশ্চিতই যে, পাকিস্তান সরকার ভারতকে জড়ানোর চেষ্টায় দু'জন এজেন্টের উল্লেখ করে, কিন্তু তাদের প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পূর্ণ তথ্যের ছিটেফোঁটা লাভেও ব্যর্থ হয়। তারা দু'জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা নির্ধারণেই ভুল করে বসে; যারা আসলে ছিলেন 'কর্নেল মেনন' ও 'মেজর ত্রিপাথী' এবং পাকিস্তানীদের ধারণা করা এর উল্টোটা নয়।

ঘ। 'র'-এর কার্যক্রম বৃদ্ধি (RAW Steps Up It's Activitiess)

ইতোমধ্যে গোয়েন্দা দপ্তরের (IB= Intelligence Bureau) পাকিস্তান শাখা 'র'-এর নতুন প্রশাসনিক কাঠামোয় বদলি হয় এবং তিনজন কর্মকর্তা সেখানে অবিরত সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনায় নিয়োজিত হন। এদের মধ্যে ছিলেন 'র'-এর যুগ্ম পরিচালক পি এন ব্যানার্জি, যিনি পূর্বাংশের প্রধান ও তাঁর সদর দপ্তর ছিল কলকাতায় এবং এস, শংকর নায়ার, যিনি দিল্লিতে 'পাকিস্তান শাখা'র দায়িত্বে ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে একটি গোপন সংস্থা গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে 'শত গুপ্তচরের' বছর এভাবেই শুরু হয়।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের পূর্বাংশের জনগণ ও এর নেতৃবর্গের প্রতি নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রাথমিক কারণ বলে বিবেচিত হয়। *কর্নেল মেননের অবিরাম ভ্রমণ ও যোগাযোগের জন্য সীমান্তব্যাপী 'র'-এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং কর্নেল মেননের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের নিবিড় যোগাযোগ ওইসব তরুণ, অবিশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত যোদ্ধাদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি করে। এভাবে ভ্রমণের ফলে 'স্থানীয় কেন্দ্র প্রধান' নির্বাচনের বিশেষ সুবিধা হয়। এ সব কেন্দ্র প্রধানদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন কর্নেল এম এ জি, ওসমানী (যিনি পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন) নেতৃত্বাধীন মেজর খালেদ মোশাররফ (পূর্বে একজন সামরিক স্টাফ অফিসার-ব্রিগেড মেজর), মেজর শফিউল্লাহ ও আব্দুল কাদের সিদ্দিকী যিনি বাঘা সিদ্দিকী ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে 'মুক্তিবাহিনী' ও 'র' এজেন্টদের মধ্যে যোগাযোগকারী রূপে আবির্ভূত হন।*

ইতোমধ্যে যখন বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন শেষ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে 'র' এজেন্টদের মাধ্যমে (যারা ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে অস্থায়ীভাবে 'র'-এর নিয়োগকৃত হয়) আন্দোলনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়, তখনই সেই ভয়াবহ 'কালো রাত্রির' পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে। অনেক পরে, শেখ মুজিব বলেছিলেন, "আজ যদি হিটলার বেঁচে থাকতেন, তবে তিনিও লজ্জিত হতেন..." শেখ মুজিব প্রকারান্তরে বাংলাদেশকে 'ধর্ষণের' কথাই উল্লেখ করেন।

ঙ। পূর্ব-পাকিস্তানী নেতাদের দাবি (Demands of East Pakistani Leaders)

বাংলাদেশ আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ফিরে যেতে হয়, যখন বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একটি গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল। (আসলে লেখক এখানে ফেব্রুয়ারি মাসের বদলে ভুলে মার্চ মাস উল্লেখ করেছেন-অনুবাদক)। এরপর 'র'-এর সূত্র মতে, ক্রমানুযায়ী ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে বিদ্রোহের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম সার্থক দিকনির্দেশক ছিল ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'। পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি নগ্ন ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং বাঙালিদের ঘৃণাভরে উল্লেখ করা হয়

"ওই সব কালো ছোটোখাটো মানুষগুলো" হিসেবে। গোয়েন্দা বিভাগের কাছে এ ধরণের মন্তব্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আর ভারতীয় আমলাদের নিকট এটি বিবেচিত হয় একটি তাৎপর্যহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে। পরবর্তী ঘটনাসমূহ অবশ্য ভিন্ন কাহিনীর জন্মকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এরূপ তাৎপর্যহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীই পরবর্তীতে পরিবর্তনের সূচনাকারীরূপে চিহ্নিত হয়।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরপর 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' বিশেষ বিচারালয়ে (Tribunal) শেখ মুজিব, প্রেসিডেন্ট আইউবকে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য বিবৃতি প্রদান করেন। এ দাবি অনুসরণ করে ১৯৬৬ সালের প্রথমদিকে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সংযুক্ত বিরোধী দল গঠনের জন্য লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভায় শেখ মুজিব তাঁর বিখ্যাত 'ছয় দফা' দাবি পেশ করেন। 'ছয় দফা' কর্মসূচি সামরিক জান্তাকে দুর্বল করে তোলে এবং নিম্নোক্ত দাবিনামা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিতে সহায়ক হয় ঃ

১। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম সংসদসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২। দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে অবশিষ্ট সব বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে।

৩। দেশের দুটি অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রা থাকবে, তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধের যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করে রিজার্ভ ব্যাংক থাকতে হবে।

৪। রাজস্ব নীতিনির্ধারণ ও কর ধার্যের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ লাভ করবে।

৫। পর্যায়ক্রমিক অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংস্কারের / পুনর্গঠনের মধ্যদিয়ে উভয়াংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে। (আসলে এ দফাটি লেখক সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন-অনুবাদক)

৬। আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার জন্য আধাসামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করতে দিতে হবে, যেখানে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই।

চ। ভোট গ্রহণের আশ্বাস (Promise of Holding Election)

সামগ্রিকভাবে এ সব দাবি দাওয়াকে পশ্চিম পাকিস্তানী, বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা যারা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে তারা ভাষাভিত্তিক উগ্র স্বাদেশিকতা হিসেবেই চিহ্নিত

করে। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আইউব বিরোধী আন্দোলন গতিময়তা লাভে সক্ষম হয়। একজন হতাশ ব্যক্তি হিসেবে প্রেসিডেন্ট আইউব জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করেন যে, তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন। পূর্ব পাকিস্তানীদের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের মনোভাবও ভিন্ন কিছু ছিল না। তবে পূর্বের মতো অতো খারাপ না হলেও সর্বময় ক্ষমতা তাঁর 'নবনির্বাচিত সামরিক জান্তার' হাতে রাখতেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। ১০ এপ্রিল তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং এর পরবর্তীতে ২৮ নভেম্বর তার প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা পুনঃনিশ্চিত করলেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর ভোট গ্রহণ করা হবে। এ ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যদিও পরে ভোটগ্রহণ ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো (ঘূর্ণিঝড়ের কারণে)। তখন পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান অনুধাবন করতে পারেননি যে, এ পদক্ষেপ গ্রহণের (ভোট) মানে হবে তাঁর 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগের বিলুপ্তি ও সামরিক শাসনের অবসান।

ছ। 'র'-এর কার্য নির্ধারণ পর্যালোচনা (Assessment of RAW)

ইতোমধ্যে 'র'-এর এজেন্টরা পূর্ব পাকিস্তানের আনাচে-কানাচে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। 'র'-এর পক্ষে কাজ করা অনেক 'ডবল এজেন্ট' পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের মধ্যে অথবা আশপাশে নেতৃত্বের পর্যায়েও ছিল (যাদের কথা 'গোপনীয়' হিসেবে কখনোও প্রকাশ করা যাবে না)। একজন নেতৃস্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ পাকিস্তানী কর্মকর্তা যিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন; তিনি 'র'-এর অপারেটরদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করেন এবং ঢাকা পতনের একদিন পূর্বে তিনি অন্য পাকিস্তানীদের সাথে নিরাপদে সরে যেতে সক্ষম হন। 'র'-এর অনুমান ছিল, যদি ডিসেম্বরে আদৌ ভোট হয়, তবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে তারা ('র') পাকিস্তানের ক্ষমতার মসনদে দেখতে পাবে (এ ব্যাপারটি 'র' এবং সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ধাঁধায় ফেলে দেয়, কারণ তাঁরা ধারণা করতে ব্যর্থ হন যে, কিসের ওপর আস্থা রেখে ইয়াহিয়া ভোট গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন। পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনীও ভুল তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল)।

জ। আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ (Awami League Wins Majority)

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভোটে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে ২০ ডিসেম্বর ফলাফল ঘোষণার পর জুলফিকার আলী ভুট্টোর উচ্চবাচ্যে ভিন্ন পরিস্থিতির আবির্ভাব অনুভূত হয়। তিনি ঘোষণা করেন, পিপলস পার্টি বিরোধী দলীয় আসনে বসবে না এবং তৎসঙ্গে যুক্ত করেন "সংখ্যাগরিষ্ঠতাই শুধুমাত্র জাতীয় রাজনীতির একক পরিমাপক নয়"। এরপর পাকিস্তান তার নিজস্ব আইন-কানুন তৈরি করতে শুরু করে।

পহেলা মার্চ ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য 'জাতীয় পরিষদের' অধিবেশন উদ্বোধন বাতিল বলে ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের একটি সমাধানে পৌঁছানোর ব্যর্থতায় এ ঘোষণা প্রদান করা হয়, যখন শেখ মুজিব সামরিকজান্তার ভয় প্রদর্শনে নত হয়ে কোনো বিনিময় চুক্তিতে আসতে অস্বীকৃতি জানান। দু'দিন পর এক বিরাট মিছিলে আওয়ামী ছাত্রনেতৃবর্গ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং এভাবেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় ও এর সাথে সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

ঝ। 'মহাপ্রলয়ের' আগমনী বার্তা (Reports of Major Crackdown)

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই করাচির 'র' এজেন্ট করাচি বন্দর দিয়ে ঢাকায় সৈন্য প্রেরণের সংবাদ পাঠায়। এদিকে লে. জে. টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ৩ মার্চে চট্টগ্রামে বালুচ রেজিমেন্টের উপস্থিতি, বাঙালি অফিসারদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ভারতীয় সীমান্ত হতে ঢাকায় সাঁজোয়া বহর স্থানান্তর, এ সব কিছু মিলে একটি আসন্ন 'প্রলয়ের' ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেই একই দিনে ঢাকার 'র' এজেন্টও 'একটি বড় ধরণের বিপর্যয় সমাগত' বলে কলকাতায় বার্তা প্রেরণ করে। করাচি ও চট্টগ্রামের তথ্যাদি এবং সাঁজোয়া বহরের ঢাকামুখী চলাচল ঢাকা হতে পাঠানো বার্তাটির পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জোগায়। অতএব যখন এ সব রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠানো হয়, তখন 'র' সদর দপ্তরের একটি 'অতিজরুরী' বার্তায় নির্দেশ দেয়া হয়, "মেননকে উপদেশ দাও.... আমাদের বন্ধুদের নিয়ে আসতে"।

ঞ। মুজিব বন্দী-তাজউদ্দীন কলকাতায় আশ্রয়প্রার্থী (Mjuib Caged – Tajuddin Seeks Refuge In Calcutta)

চট্টগ্রামে যখন পাকিস্তানী সৈন্য মাঠে নেমে পড়ে তখন 'র' অপারেটরদের দিল্লি থেকে পাওয়া বার্তানুযায়ী আদেশ পালনে পাগলপারা অবস্থা হয়। তারা দীর্ঘ বারো ঘণ্টা ধরে শেখ মুজিবকে ঢাকা ত্যাগ করার অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু মুজিব জেদের সাথে ঢাকা ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নেন। শেষে মরিয়া চেষ্টার মাধ্যমে একটি মধ্যপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। তখন পর্যন্ত কেউ জানতেও পারেনি যে, "ওদেরকে (বাঙালিদের) সমূলে উৎখাত করো" বলে টিক্কা খান একটি ঘৃণ্য আদেশ ইতোমধ্যেই প্রদান করেছেন, যে আদেশ বলে অল্প কিছুক্ষণ পরেই এমন একটি ভয়াবহ গণহত্যা সাধিত হয় যার কথা পূর্বে পৃথিবীর কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। সে সময়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পরিশেষে বিপর্যয় শুরুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে শেখ মুজিব তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সাথীকে ভারত যাত্রার অনুমতি দেন। তাঁরা হলেন সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ (যিনি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন) ও আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় যাঁরা, 'র'-এজেন্টদের সাথে সারারাত ভ্রমণ করে 'মুজিব নগরে' (পরে এ নামেই এ জায়গার পরিচিতি ঘটে) এসে পৌঁছেন ও প্রবাসে 'বাংলাদেশ সরকার' গঠন করেন।

নোংরা লুঙ্গি ও ছেড়া শার্ট পরিহিত এই দলটি সারারাত শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভ্রমণ করে এবং যশোরের উত্তর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসে পৌঁছে। এদেরকে অন্য আর দশটা শরণার্থী দলের মতোই দেখা যাচ্ছিল যারা ইতোমধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করা শুরু করেছে। তাজউদ্দীনের সাথে অন্য আর যারা ছিলেন তারা হলেন জনাব নজরুল ইসলাম, মোশতাক আহমেদ, সামাদ আজাদ এবং চারজন ছাত্রনেতা-ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক এবং সিরাজ-উল-আলম খান (লেখক এখানে কয়েকজনের নামের বানান ভুল লিখেছেন যেমন-Fazul Haq Moni, Tufal Ahmed, Abdul Razakar-অনুবাদক)। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে; কিন্তু শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের ভাগ্য ততোক্ষণ পর্যন্ত অজানাই রয়ে যায়, যতোক্ষণ না ভারতীয় গোয়েন্দা বেতার মনিটরিং ফ্রিকোয়েন্সিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো বার্তায় জানা যায়, "পাখিকে খাঁচাবন্দী করা হয়েছে।" এ সাংকেতিক বার্তার অর্থ উদ্ধার করে 'র'-এর বুঝতে বাকি থাকে না যে, উল্লেখিত 'খাঁচা বন্দী পাখি" শেখ মুজিব ব্যতীত আর কেউ নয়।

কলকাতায় অল্প কিছুক্ষণ অবস্থান করার পরই জনাব তাজউদ্দীন নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন। এর পরপরই যশোরের নিকটে পূর্ব-পাকিস্তানের ১০০ গজ অভ্যন্তরে 'মুজিবনগর' গঠিত হয়। কিন্তু বাস্তবে 'মুজিবনগর' ছিল কলকাতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বাড়ি, যেখান থেকে 'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল কলকাতায় 'বাংলাদেশ প্রাদেশিক সরকার' গঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, তাজউদ্দিনের সাথে আসা চার ছাত্রনেতা নিজেদের 'মুজিবের নিজস্ব রাজনৈতিক শিষ্য' হিসেবে পরিচিতি প্রদান করে, যা তাজউদ্দীন অন্যভাবে গ্রহণ করেন।

ট। শরণার্থী স্রোতধারা (Avalanche of Refugees)

এপ্রিলের শেষার্ধেও গণহত্যা চলতে থাকে (ধারণা করা হয় যে, ২০০,০০০ হতে ১০,০০,০০০ পর্যন্ত লোক গণহত্যার শিকার হন) এবং ৯৮,০০,০০০ লোক বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবাসী হতে বাধ্য হওয়ায় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ হুমকি দেখা দেয়। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী 'র' তাদের ধারণানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে যদি ঠিকঠাক ঘটনা না ঘটে তবে তারা (RAW) পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধের আশ্রয় নেয়ার যে কোনো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে এবং এ ব্যাপারে 'সংযুক্ত গোয়েন্দা কমিটির' তথ্য পুনর্মূল্যায়নের অপেক্ষায় থাকে। মে মাসের শেষের দিকে আরেকটি 'র' পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হয় এবং "সরাসরি হস্তক্ষেপের" প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। যে সমস্ত তথ্য 'র' দপ্তরে আসতে থাকে তাতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পাকিস্তান একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুতরাং 'র' তার সকল সম্পদ কাজে লাগিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য 'সবুজ সংকেত' লাভ করে।

ঠ। মুক্তিবাহিনী (Mukti Bahini)

'র'-এর পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তব্যাপী বিভিন্ন গোপনীয় আশ্রয়স্থান 'মুক্তি ফৌজ'কে পর্যাপ্ত আশ্রয় প্রদান নিশ্চিত করে। এতে ব্যাপক সীমান্ত এলাকার গুপ্তস্থান হতে 'মুক্তি ফৌজ'কে অনুসন্ধান করে বের করা পাক বাহিনীর জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হয়।

'মুক্তি ফৌজ' নামকরণ পরিবর্তিত হয়ে দু'মাস পর 'মুক্তিবাহিনী' নাম ধারণ করে ('মুক্তি ফৌজ' গঠিত হয় ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর কালো রাতে)। এ ক্ষেত্রে নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনবিদ্বেষ একটি বিদ্রোহী বাহিনী সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে। হাজার হাজার ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক, সৈনিক এবং আধা সামরিক বাহিনীর জোয়ান পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'মুক্তি বাহিনী'র সাহসিকতার ইতিহাস ও 'মুক্তিবাহিনীকে' একটি কার্যকর যোদ্ধাবাহিনীতে পরিণতকরণে 'র'-এর ভূমিকার কথা আজও পরিপূর্ণভাবে লিখিত হয়নি।

প্রেস রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্য সূত্র অনুযায়ী 'মুক্তিবাহিনী' চারটি প্রধান অংশ বা উপদল নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এ চারটি অংশ হচ্ছে (১) ১৫-২০ বছর বয়স্ক সর্বস্তরের তরুণ যুবক, (২) আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী তরুণ-যুবক সমন্বয়ে একদল, (৩) আধা-সামরিক বাহিনী (EPR), আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও ফ্রন্টিয়ার গার্ডস, (৪) নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকবৃন্দ বিশেষ করে 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট'।

শুরুতে মার্চ থেকে মে '৭১ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর এ সব অংশ ও তাদের সহযোগী শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে অংশ নেয়। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়। প্রথম ধাক্কাতে তারা সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করতে সমর্থ হয়; কিন্তু এ সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। অসংখ্য সু-প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত পাকিস্তানী সৈন্য (সাড়ে চার ডিভিশন অর্থাৎ ৮০,০০০ সৈনিক ও ট্যাংক, ভারী কামান এবং রোমারু বিমান) স্বল্পসময়ের মধ্যেই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। (এই তথ্যটি সঠিক নয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত পাক বাহিনীর নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪২,০০০-অনুবাদক) প্রতিরোধ বাহিনীর ছড়ানো ছিটানো অংশ তখন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ শুরু করে। যেহেতু 'র' সমগ্র সীমান্তজুড়ে প্রশিক্ষণ শিবির প্রতিষ্ঠিত করে তাই এ সব গেরিলাকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন হয়নি। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে একজন 'র' এজেন্ট তার স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন- "তারা আসছিল শ'য়ে শ'য়ে, দুর্বল অভুক্ত কিশোরের দল, তাদের আমরা খাবার, কাপড় ও প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং এটা সহজ কাজ ছিল না। বৃহৎসংখ্যক শিক্ষিত যুবক অন্তর্ঘাত, গোপন যোগাযোগ এবং 'আঘাত করো ও সরে আসো' (hit & run) পদ্ধতির গেরিলা রণকৌশলের উপর পরিচালিত সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। শত্রু অবস্থানের পশ্চাতে প্রয়োজনীয় সব প্রশিক্ষণই তাদের দেয়া হয়।"

কর্নেল ওসমানী 'মুক্তি বাহিনীর' কার্যক্রম সম্পর্কে সুখওয়ান্ত সিংকে বলেছিলেন "মে

মাসের শুরুতে আমার বাহিনী বিকেন্দ্রীকৃত দলবদ্ধ বহিনী হিসেবে পুনর্গঠিত হয়েছে এবং প্রথাসম্মত যুদ্ধকৌশলের পরিবর্তন করে ছত্রী সৈন্যের হঠাৎ হানা দেয়ার কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। যদিও এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ভূমি হারাতে হয় কিন্তু আমরা শক্র সৈন্যদের বিস্তীর্ণ প্রতিকূল গ্রামগুলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছি। যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করে তাদের সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখা হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা একশ'র বেশি শক্রকে খতম করছি এবং তারা প্রতিদিনই পশ্চিম পাকিস্তানী প্লেন বোঝাই করে কফিন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

এদিকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন অংশ ও অন্যান্য সহযোগী শক্তিকে একটি সংযুক্ত সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত করা হয়। ১৯৭১-এর জুন-জুলাই মাসের মধ্যে ১০,০০০-এর বেশি মুক্তিযোদ্ধা নিম্নোক্ত চারটি সেক্টরে কাজ আরম্ভ করেঃ (১) রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী সেক্টর, (২) ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সেক্টর, (৩) ময়মনসিংহ-সিলেট সেক্টর ও (৪) কুষ্টিয়া-যশোর-খুলনা সেক্টর। ততোদিনে এই সুসংগঠিত বাহিনীর আক্রমণ হয়ে ওঠে প্রলয়ঙ্কারী এবং ২ আগস্ট '৭১ সংখ্যা 'টাইম' পত্রিকায় লেখা হয়, "ইতোমধ্যেই প্রতিরোধ যোদ্ধারা রাতে পুরো গ্রামাঞ্চল ও দিনে এই বেশিরভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে"। কর্নেল ওসমানীও দাবি করেন যে, "সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত আমরা ২৫,০০০ পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করেছি, ২১টি জাহাজ নিমজ্জিত হয়েছে, ৬০০ ব্রিজ ও কালভার্টের ধ্বংস সাধন করা হয়েছে এবং রেলপথ ও নদীপথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।"

ডিসেম্বরের শুরুতে 'মুক্তি যোদ্ধার' সংখ্যা এক লক্ষ অতিক্রম করে এবং দিন দিন এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। কয়েকজন পর্যবেক্ষক তাদের পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন, 'মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিজেরাই পাকিস্তানী সৈন্যদের বাংলাদেশ হতে বিতাড়িত করতে সক্ষম'; কিন্তু এ ধরণের প্রচেষ্টায় একটি দীর্ঘায়িত গেরিলা যুদ্ধ ও প্রচুর রক্তপাতের সম্ভাবনা জড়িত ছিল। 'নিউজউইক' (News Week) পত্রিকার সম্পাদক আর্নল্ড ডি বোর্টগ্রেভ প্রত্যন্ত গেরিলা অঞ্চলসমূহ ভ্রমণ শেষে তাঁর পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে, "ইতোমধ্যেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। গেরিলারা গ্রামাঞ্চলে ক্রমাগত তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। সরকারি কর্মকর্তা, চাকুরে ও গ্রামীণ নেতৃত্ব, সকলেই প্রচুর সংখ্যায় বিভিন্ন ছদ্মাবরণে বিদ্রোহীদের সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছেন এবং সময়ে সময়ে নদী অতিক্রম করা ব্যতীত সরকারি সৈন্যদের কদাচিৎ শহর-বন্দরে বের হতে দেখা যায়।"

ভারতীয় বাহিনীর 'ঢাকা অভিযানের' সময় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে শেষ যুদ্ধে শরীক হয়। 'মুক্তিবাহিনীর' বিভিন্ন 'অপারেশন' সন্দেহাতীতরূপে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে। ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সংখ্যা 'দি স্টেটসম্যান' (কলকাতা থেকে প্রকাশিত) পত্রিকায় বলা হয়, 'মুক্তিবাহিনী মাসের পর মাস ধরে বিশেষ করে ঢাকা-কুমিল্লা-ময়মনসিংহ সেক্টরে যে সব খুঁটিনাটি অপারেশন পরিচালনা করে তা মিত্র বাহিনীকে রেকর্ড গতিতে ঢাকার দিকে

অগ্রসর হতে বিশেষ সাহায্য করেছে'। প্রায় ২০,০০০ মুক্তিযোদ্ধা 'শত্রুকে ক্লান্ত শ্রান্ত' (Softening the enemy) করতে নিয়োজিত রয়েছে। আবার, রায়পুরা ও নরসিংদীতে ভারতীয় বাহিনীর হেলিকপ্টারের সাহায্যে অবতরণ প্রচেষ্টা যা তাদের ঢাকার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল 'অবতরণস্থল'গুলো মুক্তিবাহিনীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকায়।

ড। উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন (Co-ordination At The Top)

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান এস, এইচ, এফ, জে, মানেকশ ছিলেন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জেনারেল। 'বাংলাদেশ অপারেশনের' দ্বিতীয় ধাপ ছিল সামরিক হস্তক্ষেপ। এ পর্যন্ত 'র'-এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হয়। এখন বাকি বোঝা কাঁধে নেয়ার দায়িত্ব জেনারেল মানেকশ'র ওপর বর্তায়। তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন 'ভারতীয় প্রতিরক্ষা' সংক্রান্ত নীতিমালা শুধু সামরিক পদ্ধতিতে কার্যে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র, অর্থনৈতিক এবং অভ্যন্তরীণ নীতিমালার সাথে প্রতিরক্ষার একান্ত সমন্বয় সাধন প্রয়োজন; আরো বৃহৎ অর্থে গোটা জাতির 'রাষ্ট্র সম্পর্কীয়' সচেতন চিন্তা-চেতনার সাথে 'প্রতিরক্ষা নীতি' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'চিফস অব স্টাফ কমিটির' চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি একটি ব্যাপক কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে সরকারের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ওপর জোর দিলেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা প্রয়োগের আবেদন জানালেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকায় তিনি এ সব আবেদন পেশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটিকেও এ ব্যাপারে অবহিত করতে সমর্থ হন। এই প্রথমবারের মতো একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি জনাব ডি, পি, ধর যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি ছিলেন, তাঁকে 'যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরিষদে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে সামরিক পক্ষে 'র', আই বি (Intelligence Bureau) ও তিন বাহিনীর মিলিত 'ডিরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স'-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'সংযুক্ত গোয়েন্দা কমিটি' (Joint Intelligence Committee) গঠিত হয়, যার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান। এভাবে উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছিল।

একইভাবে 'সংযুক্ত পরিকল্পনা কমিটি' আন্তঃবাহিনী সমন্বয়ে একটি সমন্বিত কার্য পদ্ধতি উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকে ও সম্মিলিত বাহিনীর 'অপারেশনাল সদর দপ্তর' স্থাপনের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়। বেসামরিক পর্যায়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তার প্রয়োগে নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি 'সেক্রেটারিয়েট কমিটি' গঠিত হয়। প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও পররাষ্ট্র সচিব সমন্বয়ে এই সচিব পর্যায়ের কমিটি কাজ আরম্ভ করে এবং 'র' প্রধান কাও (Kao) সদস্য সচিব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার ওপর ভিত্তি করে ওই সব মন্ত্রণালয়ের সচিবগণকেও অবস্থাভেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পকিল্পনার প্রয়োজনীয় পর্যায়ে বি এস এফ-এর মহাপরিচালক, সিভিল ডিফেন্সের প্রধান, অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর প্রধানগণ ও বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কীয় বাহিনীকে পরামর্শ গ্রহণের জন্য আলোচনায় ডাকা হয়। জেনারেল মানেকশ' ও ডি পি ধর এ দু'জনই প্রকৃত নির্দেশনা, সমন্বয় ও

তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটিকে সার্বক্ষণিক সম্পূর্ণ বিষয়ে অবহিত রাখা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিকে কখনই আমলাতান্ত্রিক লালফিতার গোলকধাঁধায় জট পাকাতে দেয়া হয়নি। কাও (র-প্রধান) ও ধরের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া এবং মানেকশ' ও ধরের মধ্যকার সুসমন্বয় শেষ পর্যন্ত লাভজনক ফললাভে সমর্থ হয়।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ড. এ, এম মালিককে টিক্কা খাঁনের স্থলাভিষিক্ত করে সারা পৃথিবীকে 'বেসামরিক সরকার' প্রতিষ্ঠার ধোঁকাবাজিতে আচ্ছন্ন করে। এই সময়ক্ষেপণ কৌশল শুধু মুক্তিবাহিনীকে আরো সুসংগঠিত হতে অধিক সময় প্রদান করে। 'র'-এর বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, মুক্তিবাহিনীর দিন দিন শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও পাকিস্তান বাহিনীকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং 'সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণই' হচ্ছে একমাত্র সমাধান।

ঢ। পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা (Pakistan Declares War)

'র'-এর 'সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের' সত্যতা প্রমাণ করে ৩ ডিসেম্বর বিকাল ৫-৩০ মিনিটে ইয়াহিয়া খান সর্বাত্মক যুদ্ধের পন্থা বেছে নেন। নয়াদিল্লির ধারণা মতে পাকিস্তানের এতোশীঘ্রই যুদ্ধঘোষণা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কারণ তারা এ ব্যাপারে তাদের সময়ের হিসেব সঠিকভাবে মিলাতে পারছিলেন না। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কলকাতায়, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম ছিলেন তাঁর নির্বাচনী এলাকা বিহার সফরে দিল্লির বাইরে, অর্থমন্ত্রী ছিলেন বোম্বেতে এবং প্রেসিডেন্ট ভি, ভি, গিরি সংসদ লনে এক সংবর্ধনা সভায় ব্যস্ত ছিলেন; তখন হঠাৎ বিমান হামলার সতর্ককারী সংকেত বেজে ওঠে। যে মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানী আক্রমণের সংবাদ পান তখনি তিনি রাজধানীতে ছুটে আসেন। এরপর সেই রাতেই জেনারেল অরোরা সেনা সদর দপ্তর থেকে 'এগিয়ে যাও' (Go Ahead) সংকেত পান। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণে উল্লেখ করেন "বাংলাদেশের যুদ্ধ আজ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।"

গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আয়োজিত পদক্ষেপসমূহ এবার ফলদায়ক রূপে প্রতিভাত হয়। ২ ডিসেম্বর পেশোয়ারের 'র' এজেন্ট বার্তা পাঠায় যে, সপ্তম পাকিস্তানী ডিভিশন ভারতের পশ্চিমে পুঞ্চ ও চম্ব এলাকায় অগ্রসর হচ্ছে। 'এগিয়ে যাবার' সংকেত ও কলকাতায় জেনারেল অরোরার পূর্ব কমান্ডের সদর দপ্তর স্থাপনের পরপর পূর্ব-পাকিস্তানব্যাপী 'র'-এর গোপনীয় নেটওয়ার্ক পূর্ণ শক্তিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। যে সব এলাকায় পাকিস্তানী শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল, সে সব জায়গায় অনুপ্রবেশকারী গোপনীয় ওয়্যারলেস সেটগুলো সরব হয়ে ওঠে। সামরিক লক্ষ্যস্থল ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র ঢাকা। 'বার দিনের যুদ্ধ' নামে পরবর্তীতে পরিচিত সামরিক অভিযান এভাবেই শুরু হয়েছিল।

ণ। গেরিলা কার্যক্রম বৃদ্ধি (Guerillas Accelerate Activities)

'র'-প্রতি ছয় সপ্তাহে ২,০০০ গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়, যারা শত্রুকে 'আঘাত করো ও

সরে আসো' (Hit and Run) পদ্ধতিতে মোকাবেলায় সক্ষম ছিল এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে অনেক জায়গায় গভীরভাবে পর্যুদস্ত ও নাজেহাল করেছিল। জুলাই পর্যন্ত শুধু সীমিত পরিসরে হানা দেয়ার (Raids) কাজ চলতে থাকে। 'র' এজেন্ট, ধার করা বি, এস, এফ জোয়ান ও ছোট ছোট গ্রুপে মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ১০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বিভিন্ন অপারেশন চালাতে থাকে। শত্রুবাহিনী দখলকৃত অঞ্চলের গভীরে গোপন অনুপ্রবেশ পাকিস্তানী সৈন্যদের বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে। এক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর অপারেশন ক্রমান্বয়ে শুধু শত্রুকে নাজেহাল করা ও অস্ত্র কেড়ে নেয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিক যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটিয়ে জোরালো রূপ ধারণ করে।

'অফিস অব স্পেশাল অপারেশনস' (OSO)-এর একটি 'স্পেশাল অপারেশন উইং' এরপর পাকিস্তানী সৈন্যদের চলাচলের তথ্য সংগ্রহের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। মাঝে মধ্যে প্রায়ই ইচ্ছাকৃতভাবেই মুক্ত বেতার তরঙ্গে পাকিস্তানীরা তাদের সৈন্য চলাচল ও অবস্থানের খবর প্রচার করতো যা কিছুটা হলেও ও, এস ও (OSO)-কে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী মুক্তিবাহিনীর মধ্যে তাদের এজেন্টের অনুপ্রবেশ ঘটায়। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কোনো এলাকায় অপারেশন করে সাথে সাথে সে স্থান থেকে সরে আসার ফলে অনুপ্রবেশকারীরা তাদের কন্টাক্ট বা গোপন সংবাদ বহনকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তান গোয়েন্দাবাহিনীর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে লে. জে. নিয়াজী পাকিস্তান বাহিনীর অধিনায়ক ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। অন্যদিকে ব্যাপক অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা পাকিস্তানী নিয়ন্ত্রকদের জীবন বিপন্ন করতে শুরু করে।

ত। ঢাকার পতন (Fall of Dhaka)

এদিকে ঘটনা এগিয়ে যায় খুব দ্রুত। পাকিস্তানী প্রতিরোধের দ্বীপগুলো (এখানে পূর্ব-পাকিস্তান বিভিন্ন বড় বড় নদী দ্বারা দ্বীপের মতো বিভক্ত ছিল বলে এ শব্দটি লেখক ব্যবহার করেছেন-অনুবাদক) এড়িয়ে ভারতীয় বাহিনীর 'ঢাকা অভিযান' দ্রুতগতি লাভ করে। 'র' এজেন্টদের সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ সব প্রতিরোধ সহজে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। কোনো কোনো এলাকায় পাকিস্তানীরা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু মুক্তিবাহিনীর ক্রমাগত 'উৎপাত' ও ভারতীয় বাহিনীর দ্রুত সাফল্য তাদের হতাশায় নিমজ্জিত করে। ঢাকা ও এর আশপাশে ক্রমাগত কামানের গোলাবর্ষণ পাকিস্তানী পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরকে পুরোপুরি অচল করে দেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের জন্য কোনো আদেশ প্রেরণে পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়।

ভারতীয় বাহিনী যখন চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ে যাচ্ছে, তখন ১২ ডিসেম্বর অত্যন্ত চতুরতার সাথে জাতিসংঘে পাকিস্তানী দূত কোনো রাজনৈতিক সমাধান ছাড়াই যুদ্ধবিরতি ঘোষণার দাবি করে বসেন। এদিকে গোয়েন্দা বেতার তরঙ্গে ধৃত একটি

পাকিস্তানী বার্তা পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে সাহায্য করে। ওই বার্তায় উল্লেখ ছিল, "আমরা দুপুর ১২টায় গভর্নর হাউসে এক আলোচনা সভায় মিলিত হচ্ছি।" ওই বার্তা থেকে বোঝা যায় যে, একটি উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং আলোচনা ভেঙে দেয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু ভারতীয় বিমান বাহিনীর পূর্ব কমান্ড বোমাবর্ষণের লক্ষ্যস্থল 'গভর্নর হাউসের' অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়। সেনা ও বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে উত্তেজিত অনুসন্ধানও ব্যর্থ হয়ে যায়। এদিকে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসে; তখন শেষ মূহূর্তে তড়িঘড়ি করে 'র' এজেন্ট যারা পূর্বে ঢাকায় ছিল তাদের সভা ডাকা হয়। এ সব এজেন্ট পাকিস্তানী বর্বরতার শুরুতেই ঢাকা ত্যাগ করে চলে আসেন। এদের একজন তার কাছে রয়ে যাওয়া একটি 'ট্যুরিস্ট ম্যাপ' হাজির করে। যদিও ম্যাপের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ তবুও খুব দ্রুত একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয় যাতে গভর্নর হাউসের একদম সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করা হয় এবং বিমান বাহিনীর পাইলটকে 'র'-এর প্রস্তুতকৃত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানের চিহ্নসহ ওই ম্যাপটি হস্তান্তর করা হয়। ওই নির্দেশক ম্যাপে পল্টন ময়দানকে চিহ্নিত করা হয় যেখানে গম্বুজে গাঢ় নীল রেখা ধারণকারী একটি বড় মসজিদ ও এর সন্নিকটে অন্যান্য বাড়ি থেকে দূরে একা একটি বাড়ি নির্দেশ করা হয় এবং ঐটিই ঢাকার গভর্নর হাউস। এরপর কলকাতা থেকে 'হকার হান্টার' বোমারু বিমান উড়ে এসে ঠিক ১২টার সময় গভর্নর হাউসে বোমা ফেলে।

পরবর্তীতে সংগৃহীত বর্ণনানুযায়ী গভর্নর মালিক সে সময় ভূগর্ভস্থ কক্ষে আশ্রয় নেন ও প্রার্থনা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বাংকার হতে বের হয়ে তিনি তাঁর সকল সহকর্মীসহ পদত্যাগ করেন ও ইয়াহিয়া সরকারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে 'রেডক্রসের' নিয়ন্ত্রণাধীন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে পাকিস্তান সরকারের একমাত্র অবশিষ্ট প্রতিনিধি সামরিক প্রশাসক জেনারেল নিয়াজীর কাঁধে সব দায়িত্ব এসে চাপে। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত; দু'দিন পর নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন এবং বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।

থ। সামরিক অভ্যুত্থান (The Coup)

স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শেখ মুজিব নির্বাচিত হয়েছেন এর- কর্ণধার হিসেবে। *'র' এজেন্টরা তখনো নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে নজর রাখা অব্যাহত রাখে।* ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে 'র'-এর সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলার ইঙ্গিত দেয়া শুরু করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এ সম্ভাবনা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়, যখন দু'টি বড় রকমের ধর্মঘটের পরপর ক্ষুধার্ত জনতার বিরাট মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিশৃঙ্খল অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে ১৯৭৪ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব এক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর 'র'-সূত্রানুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থা ক্রমান্বয়ে জটিল আকার ধারণ করতে থাকে।

এদিকে অন্যান্য তথ্য সূত্র অনুযায়ী বিদেশী গোয়েন্দা এজেন্সিগুলোর অতিরিক্ত সচলতার

আভাস পাওয়া যায়। শংকর নায়ার যিনি ততোদিনে মুজিব সরকারের নিকট একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে নন্দিত, তিনি বাঘা সিদ্দিকীকে সাথে নিয়ে মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁকে চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। মুজিব বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করা অন্যান্য ঘটনাবলী নিয়ে এতোই চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি আসন্ন সামরিক অভ্যুত্থানকে গুরুত্ব দেয়ার ফুরসতই পাননি।

চার মাস পর 'র'-এজেন্টরা জিয়াউর রহমানের বাসায় মেজর ফারুক, মেজর রশিদ ও লে. কর্নেল ওসমানীর একটি সভার তথ্য লাভে সমর্থ হয়। অন্যান্য বিষয়ে আলাপ হলেও সামরিক অভ্যুত্থান নিয়েই আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল। তিন ঘন্টাব্যাপী আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী উদ্দেশ্যহীনভাবে কাগজে কিছু লিখে ফেলেন ও পরে তা অমনোযোগবশত ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেই দোমড়ানো কাগজটি আবর্জনা স্তুপ হতে একজন কেরানী ('র' এজেন্ট) সংগ্রহ করতে সমর্থ হন ও পরে তা দিল্লির 'র' সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অভ্যুত্থান অত্যাসন্ন বুঝতে পেরে কাও ('র'-প্রধান) একজন বিশ্বব্যাপী রপ্তানীকারকের ছদ্মাবরণে ঢাকা এসে পৌছেন। ঢাকা পৌছার পর তাঁকে পূর্বনির্ধারিত একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। মুজিব এরূপ ঘটনাকে চরম নাটকীয়তারূপে গণ্য করেন ও কাও কেন সরকারিভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন না তা ভেবে অবাক হন। কিন্তু কাওকে ব্যক্তিগতভাবে চেনার সুবাদে তিনি তাঁর এ হেঁয়ালিপূর্ণ আচরণের ব্যাখ্যা শুনতে রাজি হন। মুজিব-কাও আলোচনা একঘন্টা স্থায়ী হয়। কাও মুজিবকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হন যে, একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা পরিকল্পনাধীন ও তাঁর (মুজিবের) জীবন বিপদাপন্ন; তথাপি তিনি এ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় জড়িত সন্দেহভাজন অফিসারদের নাম উল্লেখ করার পরও শেখ মুজিব মন্তব্য করেন, "এরা আমারই সন্তান এবং এরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না"; এভাবেই শেখ মুজিবের মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে।

দ। মুজিব হত্যাকাণ্ড (Mujib Massacared)

তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে ১৪ আগস্টের এক উত্তপ্ত রাতে সেনাবাহিনীর একটি মহড়া অনুষ্ঠানের নামে সৈন্য পরিচালনা লক্ষ্য করা যায়। 'বেঙ্গল ল্যাঞ্চারস' ও বাংলাদেশ সাঁজোয়া কোর রাজধানীর বাইরে অর্ধনির্মিত বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় (এখানে লেখক একটি ভুল করে থাকবেন, তা হলো বেঙ্গল ল্যাঞ্চারসই তখন একমাত্র ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট তাই আলাদাভাবে বাংলাদেশ সাঁজোয়া কোর সম্পূর্ণ অপারেশনে অংশ নিতে পারে না। কারণ বেঙ্গল ল্যাঞ্চারস একটি অপারেশনাল ইউনিট, পক্ষান্তরে সাঁজোয়া কোর একটি প্রতীকী নাম, যেমন সিগন্যাল কোর, আর্টিলারি কোর ইত্যাদি-অনুবাদক)। এরূপ সৈন্য পরিচালনার ব্যাপার পূর্বেও ঘটেছে, তাই যারা তাদের বাইরে যেতে দেখলেন তারা স্বভাবতই অন্যকিছু ধারণা করতে পারেননি। এর কয়েকঘন্টা পর সে রাতেই শেখ মুজিব ও তাঁর ৪০ জন আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের অন্যরা নিহত হন। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সময় লাগে মাত্র তিন মিনিট। শেখ মুজিবের দুই ভাগিনা বাংলাদেশ টাইমস সম্পাদক

শেখ মণি ও বাকশালের ছাত্র সংগঠনের সম্পাদক শেখ ইসলাম কর্তৃক শেখ মুজিবকে স্বয়ং অপহরণ করার একটি পরিকল্পনার কথা হত্যাকাণ্ড ঘটার একঘন্টা পর জানা যায় ('র' জানতে পারে), কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এ অভ্যুত্থান শেখ মুজিবের চার দশকের ঘনিষ্ঠ সহচর খন্দকার মোশতাককে ২০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসায়।

হত্যাকাণ্ডের পরপরই সি, আই, এ 'র'-এর ঘাড়ে এর দায়-দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা চালায় ও উল্লেখ করে যে, এ অভ্যুত্থান 'র'-এর পরিকল্পনার ফসল। 'র'-সূত্র অবশ্য জানতে পারে, সি, আই, এ শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং সম্ভবত বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই এ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নেয়া হয়। ১৯৭১-এর জুনে ঢাকার সি আই এ আঞ্চলিক প্রধান (Station Chief) ফিলিপ চেরী মুজিবের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন বলে ধারণা করা হয়। মুজিব মারা যাবার কয়েক মাস পূর্বে ১৯৭৪-এর আগস্টে তড়িঘড়ি করে ঢাকা যাবার প্রাক্কালে চেরী দিল্লিতে আসেন।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তার সব সমস্যার জন্য ভারতকে দায়ী করতে আরম্ভ করে যা, দেশে-বিদেশে সব জায়গাতেই 'রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক' থাকায় বিশ্বাস করা সহজ ছিল। আমেরিকানদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুজিব কিছু সময়ের জন্য আমেরিকান পন্থা অনুসরণ করেন। তবে কিছুদিন পর ১২ মে '৭৫ এ মুজিবের দিল্লি সফরের পর তিনি পুনরায় তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেন। এ পরিস্থিতি সি আই এ'কে তাই অন্য ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করে যা সম্ভবত অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সহায়তা দেয় এবং এর ফলে মুজিব নিহত হন।

এটা অত্যন্ত আশ্চর্য ও দুর্ভাগ্যজনক হলো, অভ্যুত্থানে যে ট্যাংক ব্যবহার করা হয় তা মুজিব ১৯৭৩ সালে মিসর সফরের সময় নিজে সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৭৩-এর যুদ্ধে মিসরকে সমর্থন করার বিনিময়ে মিসর সরকার ট্যাংক উপহার নেয়ার জন্য মুজিবকে অনুরোধ করে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কোনো ট্যাংক না থাকায় তিনি তা গ্রহণে সম্মত হন।

রাজনৈতিক গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটানো সি আই এ'র নিকট নতুন নয় এবং এ ধরণের পরিস্থিতি তারা ইতোমধ্যেই গোটা দক্ষিণ আমেরিকায় ছড়িয়ে দিয়েছে। এগুলো উচ্চ স্টেকে জুয়াখেলা ছাড়া কিছুই না এবং সবসময়ই কেউ না কেউ এ সবের মূল্য পরিশোধ করে থাকেন। গোটা পৃথিবী পরম নিশ্চিন্তে অভ্যুত্থানের পরদিন পর্যন্ত এ হৃদয়বিদারক ঘটনা সম্পর্কে অনবহিত রয়ে যায়। পরদিন ঢাকা রেডিও ঘোষণা করে "জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁর স্বৈর সরকারের পতন ঘটেছে।" মুজিব মারা গেলেন বটে, তবে সে সাথে তাঁর 'সোনার বাংলার' স্বপ্নসাধও মাঠে মারা গেল।

ধ। পাল্টা অভ্যুত্থান (The Counter Coup)

এরপর বাংলাদেশে দ্রুত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা শুরু হয়। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাককে ক্ষমতাচ্যুত করেন। কিন্তু আবার আরেকটি পাল্টা অভ্যুত্থান ৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। বছর কয়েক পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভারত সফরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার সময় 'র' প্রধান কাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর এক প্রশ্নের জবাবে জিয়া কাওকে উল্লেখ করে মন্তব্য করেন "যতোটুকু না আমি জানি, তার থেকে এই ভদ্রলোক বেশি জানেন- আমার দেশ কিভাবে চলছে।" এই ছিল 'র'-এর ক্ষমতা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপযুক্ত স্বীকৃতি।

অধ্যায় : ৭

'অপারেশন সিকিম'

'Special Operation : Sikim'

'অপারেশন বাংলাদেশ' শেষ। এক মাস পর একজন উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা 'র' প্রধানের অফিসের বারান্দা দিয়ে হেঁটে (যাচ্ছিলেন) সভাকক্ষের দরজার নিকটে এসে থামলেন। টোকা দেয়ার পূর্বেই তাঁকে সাদরে ভিতের নিয়ে যাওয়া হলো।

সেখানে চারজন লোক নীরবে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। শান্ত নীরব পরিবেশ তপ্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো মুহূর্তে, "ভালো দেখিয়েছেন, কাজটা ভালোভাবেই হয়েছে (পাকিস্তান দ্বিখণ্ডীকরণ), এখন আমাদের পরবর্তী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।" বাকি চারজন বিস্মিত হয়ে ভেবেই পেলেন না 'এরপর আবার কি?' "সিকিম, ভদ্রমহোদয়গণ সিকিম, দেখুন এটা নিয়ে কি বের করতে পারেন। আপনারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে ২৪ মাস সময় পেতে পারেন, অবশ্য সরকার যদি আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা নেয়"। বাকি আলোচনায় সকলেই একটার পর একটা আশ্চর্য অথচ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথাই শুনলেন আর নতুন চিন্তার সূত্রগুলো সাজাতে লাগলেন গোয়েন্দা মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে। অবশ্য ওই ক্ষমতাবান কর্মকর্তার এটা কোনো অফিসিয়াল সভা ছিল না বটে তবুও সিকিম নিয়ে আনঅফিসিয়াল চিন্তাভাবনা এভাবেই শুরু।

ক। 'অস্থিতিশীল সিকিম' (Turbulent Sikim)

তিব্বত, নেপাল, ভুটান এবং পশ্চিম বাংলা দ্বারা বৃত্তাবদ্ধ হিমালয়ের পূর্বে অবস্থিত সিকিম একটি মনোমুগ্ধকর রাষ্ট্র। এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নির্ভর করে তিব্বতের (চীন) ও সিকিমের মধ্যবর্তী ভারতের অবস্থানের উপর (১৯৬২ সালে যুদ্ধে সিকিম চীনাদের কাছে ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলার একটি চমৎকার স্থান বলে বিবেচিত হয়েছিল, ১৯৭১ এর যুদ্ধেও ভারতের ভয় ছিল যে পাকিস্তান আর্মি হয়তো পূর্ব পাকিস্তানে তেঁতুলিয়া সীমান্ত হয়ে সিকিমের মাধ্যমে ভারতকে ভাগ করে ফেলবে, যার ফলশ্রুতিতে ভারতের পূর্বাঞ্চল হবে সরবরাহশূন্য আর সে অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানকে ঘিরে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাশে যুদ্ধ চালনা করা হবে অসম্ভব-অনুবাদক)।

চারটি প্রাচীন সম্প্রদায় সিকিমের আদি ও মূল অধিবাসী, এগুলো হলো লেপচা, ভুটিয়া, নেপালিজ ও সন্‌স। সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা হলো লেপচারা, যারা আবার রঙ্গ-পা বা গিরিখাদের উপজাতি বলেও পরিচিত। এরা সকলেই আসাম থেকে এসে সিকিমে সর্বপ্রথম বসিত স্থাপন করে। তারপর চৌদ্দশ শতাব্দীতে তিব্বত থেকে আসে ভুটিয়ারা,

যাদের অনুসরণ করে আঠার উনিশ শতাব্দীতে নেপালীরা এসে বসবাস শুরু করে। সিকিমের শাসনকর্তা ছিল লেপচা-ভুটিয়া জাতিভুক্ত, যারা নীতির জন্য নেপালীদেরকে শাসনকার্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো, যদিও নেপালীদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই স্বজনপ্রীতিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাসকগোষ্ঠী ও সংখ্যাগুরু শ্রেণীর মধ্যে অবিরত রেষারেষির অন্যতম কারণ।

সিকিমের ইতিহাস জাতিগত দ্বন্দ্ব ও অস্থিতিশীলতার ইতিহাস। এর সাথে ছিল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সাথে ক্রমাগত হানাহানি ও দীর্ঘস্থায়ী কোন্দল। ভারতে বৃটিশ রাজশক্তির অনুপ্রবেশের পর সিকিমও বৃটিশ রাজনৈতিক কূটচালে পতিত হয়। প্রথম বড় ধরণের ধাক্কাটি আসে ১৮৩৫ সালের সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে যেখানে উল্লেখ ছিল "গভর্ণর জেনারেল মহাশয় দার্জিলিং পার্শ্ববর্তী পাহাড়শ্রেণী অধিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যাক্ত করিয়াছেন-এ জন্য যে, ইহার ঠাণ্ডা মনোরম আবহাওয়া সরকারি চাকুরেদের রোগমুক্তি লাভে সহায়ক হইবে। আমি- সিকিমের রাজা, সদাশয় গভর্নর জেনারেলের সহিত বন্ধুত্বের সম্মানে, দার্জিলিংকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বরাবর উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম।"

১৮৫৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সম্পাদিত এ চুক্তির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সিকিম রাজা বিশেষ কিছুই ভাবেননি, যা ২৬ বছর পর সিকিমকে ভাবনায় ফেলেছিল।

এরপর অবিরাম সংঘর্ষ চলতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৫০ সালে 'দণ্ড বিধায়ক' সমন্বয়ে একটি বৃটিশ অভিযাত্রীদল পাঠানো হয় যার অনুসরণ করে ১৮৬১ সালে আরো বড় একটি দল সিকিমকে ১৮৬১ সালের চুক্তিতে আসতে বাধ্য করে। এ চুক্তির প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়, "সিকিমে মহারাজার রাজ কর্মকর্তা ও পারিষদবর্গ অবিরাম দুর্ব্যবহার ও লুটতরাজ চালাইতেছে এবং মহারাজার বৃটিশ সরকারকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানে অমনোযোগিতা-বৃটিশ সরকারের সহিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পূর্বের মধুর সম্পর্কের অবনতির কারণ; এ সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া বৃটিশ বাহিনী অবশেষে সিকিম দখল করিতে বাধ্য হইলো।"

এদিকে সিকিম-তিব্বত বৈরীতার অবসান হয় ১৮৯০ সালের এ্যাংলো-চাইনিজ কনভেনশনের মাধ্যমে। সিকিম, বৃটিশ সরকারের একটি 'আশ্রিত রাজ্য' হিসেবে চীনের স্বীকৃতিও লাভ করে। ১৮৮৯ সালে ক্লড হোয়াইট প্রথম বৃটিশ রাজনৈতিক অফিসার হিসেবে সিকিমে মনোনয়ন লাভ করেন, যিনি পরবর্তীতে সিকিমের শাসকে পরিণত হন। এরপর ১৯১৮ সালে আবার মহারাজার নিকট রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, কিন্তু সিকিম বৃটিশের 'আশ্রিত রাজ্য' হিসেবেই থেকে যায় এবং ১৯৩৫ সালের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের একটি রাজ্যে পরিণত হয়।

১৯৪৬ সালে ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করলেন "একদিকে রাজ্যসমূহ অন্যদিকে বৃটিশ রাজ এবং বৃটিশ ভারতের মাঝে রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থা নিরূপণে

এখানেই ইতি টানা প্রয়োজন। ওই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করার জন্য রাজ্যগুলোকে ক্রমানুযায়ী ফেডারেল সরকারের ব্যবস্থাধীনে আনা হইবে অথবা এর ব্যর্থতায় ওই সমস্ত রাজ্য বৃটিশ রাজ বা বৃটিশ-ভারত ও বৃটিশ রাজ উভয়ের সহিত নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে আনীত হইবে।" স্বাধীনতার পরপরই ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে সিকিমের মর্যাদা-সিকিমের প্রতিনিধিদের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে চুক্তি সাধিত হয় এ শর্তে, "সিকিম ভারতের আশ্রিত রাজ্য হিসেবেই থাকিবে। ভারতীয় সরকার সিকিমের পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবেন এ বিবেচনায় অভ্যন্তরীণ সরকার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবেন, যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় সরকার আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা তদারকের মুল দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।"

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, সিকিমের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বাধীন ভারতের একটি অঙ্গরাষ্ট্র হিসেবেও একটি দায়িত্ববান সরকারের জন্য আন্দোলন করে আসছিল। এ সব দলগুলোর মধ্যে প্রধানতম ছিল 'সিকিম স্টেট কংগ্রেস'। দ্বিতীয় জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল 'সিকিম ন্যাশনাল পার্টি', বৃটিশ রাজের সাথে পূর্বের অনুসৃত সম্পর্কের ন্যায় ভারতের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক দাবি করছিল। তবে, 'প্রজা সম্মেলন পার্টি' মোটামুটি স্টেট কংগ্রেসের ন্যায় ভারতের সাথে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করে। এ তিন দলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জনরোষ বৃদ্ধি পাওয়ায় সিকিম সরকার এ পর্যায়ে কয়েকজন 'স্টেট কংগ্রেস' নেতাকে গ্রেপ্তার করেন ও একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে মধ্যবর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এই পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের জন্য গোলমাল পাকিয়ে উঠে ও পরিস্থিতি হয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল।

এ রকম পরিস্থিতিতে তিনটি দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়- প্রথমতঃ জনগণের সমর্থনে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা ও সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্বিগ্ন ভারতীয় সরকার, দ্বিতীয়ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দাবিতে উচ্চকিত জনগণ ও তৃতীয়ত অন্য একদল যারা পূর্বোক্ত দুই দলের মাঝামাঝি নির্বিরোধী ভূমিকা পালনেই সন্তুষ্ট।

আসন সংখ্যা বিতরণ ও 'চোগিয়ালের' (Chogyal-ধর্মরাজা) মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে বিতর্ক একটি জনপ্রিয় মন্ত্রিপরিষদ গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে একজন ভারতীয় 'দেওয়ানের' নিযুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০ মার্চ ১৯৫০ সালে মন্ত্রণালয়ের প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয় যে, "বর্তমান সময়ের জন্য একজন ভারতীয় কর্মকর্তা রাজ্যের দেওয়ান হিসেবে রাজ্যের কার্যাদি পরিচালনা করিবেন"। ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে সিকিম মহারাজা 'তাসি নামগয়াল' ও সিকিমের ভারতীয় কর্মকর্তা 'হরিশ্বর দয়ালের' মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাসি নামগয়াল ১৯৬৩ সালের ২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন ও 'পালদেন থনদুপ' তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ১৯৫৭ সালে প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর ১৯৬৪ সালে 'হোপ কুক' নামের একজন আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করেন। ১৯৬৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে ভারতীয় সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 'মহারাজার' স্থলে 'চোগিয়াল' (ধর্ম রাজা) ও মহারাণীর জায়গায় 'গিয়ালমো' (Gyalmo) উপাধিকে স্বীকৃতি দান করেন।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর দেখা যায় যে, ১৮টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে 'সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস' ৮টি, সিকিম ন্যাশনাল পার্টি ৫টি, সিকিম স্টেট কংগ্রেস ২টি ও অন্যান্য দল ৩টি আসন লাভ করে। ১৮টি নির্বাচিত আসনের সাথে সাথে 'চোগিয়াল' ৬ জন সদস্য মনোনীত করেন (তিনজন সরকারি কর্মকর্তা ও তিনজন দল নিরপেক্ষ ব্যক্তি)। এবার পরিবেশ হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জন্য চমৎকার তীর্থভূমি।

খ। সি আই এ'র টোপ (CIA-"Baiting Game")

'র'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ছোট্ট রাজ্য সিকিমে সি আই এ'র অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এতোদিন অবশ্য সি, আই, এ সিকিমে কোনোবার নাক গলায়নি, কিন্তু সি আই-এর কলকাতার 'রেসিডেন্ট এজেন্টকে' সম্প্রতি হরহামেশাই সিকিমের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে 'আড্ডা মারতে' অর্থাৎ যোগাযোগ করতে দেখা যায়। এটিও সন্দেহ করা হয় যে, 'চোগিয়ালকে' একটি নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতসহ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উস্কানি দেয়া হয়। 'চোগিয়ালকে' জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভে উত্তেজিত করার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সিকিম নিয়ে সি আই এ'র টোপ ফেলা এখানেই শুরু। চোগিয়াল যাতে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য চীনা আক্রমণের অজুহাত খাড়া করে সি আই এ 'পরিস্থিতি সৃষ্টিতে' সচেষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও 'র' এ ক্ষেত্রে চীনা আক্রমণের সম্ভাবনার কথা নাকচ করে দেয়।

গ। 'র'-এর মৌলিক তথ্য সংগ্রহ (RAW Gathers Basic Data)

সিকিম বাংলাদেশ নয়। এ ক্ষেত্রে যে কোনো সামরিক পদক্ষেপ অনতিক্রম্য সমস্যার সৃষ্টি করবে বলেই অনুমান করা যায় (ভিতরে ও বাইরের জনসমর্থন ও আন্তর্জাতিক চাপ)। বিশ্ব জনমত বাংলাদেশ অপারেশনের মতো পক্ষে নাও থাকতে পারে। তাই এর সমাধান হতে হবে রাজনৈতিক। নয়তো ভারতকে হয় অস্থিতিশীল সিকিমের বোঝা কাঁধে নিতে হবে, না হয় সিকিমে বিদেশী হস্তক্ষেপ মেনে নিয়ে চলতে হবে।

অতঃপর সিকিমের চারটি জেলা সদর গ্যাংটক, মাঙ্গান, নামচিও, গিয়ালসিং-এ 'র'-এর এজেন্টদের অনুপ্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে অপারেশনাল তথ্যাদি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে এবং ভারতকে যদি মাঠে নামতেই হয় তবে যেন সবকিছু গুছানো পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করার চেষ্টায় থাকে। আগন্তুকের সাথে 'র' সদর দপ্তরে 'চারজন' কর্মকর্তার আলাপচারিতার (এ প্রবন্ধের প্রথমে উল্লেখিত) আঠার মাসের মধ্যে 'র'-এর 'সব প্রস্তুতি শেষ হয়', এখন শুধু মাঠে নামার পালা। এ সবের পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 'সিকিম অপারেশন' সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় এটা অবশ্য নিশ্চিতই ছিল যে, সিকিমে স্বৈরতন্ত্র কায়েমে সি আই এ'র প্রচেষ্টা সফল হবে না এবং যদি সে ধরণের কোনো চেষ্টা হয়ও তবে তা হবে রক্তক্ষয়ী প্রচেষ্টা। ভারত বরাবরই সিকিমের শান্তি ও উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী এবং সে মনে করে অস্থিতিশীল প্রতিবেশী সব সময়ই তার নিরাপত্তার ব্যাপারে আতঙ্কস্বরূপ।

এদিকে সিকিমের পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যেতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালীরা ইতোমধ্যেই সরকারে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় যা তাদের মিথ্যাবাদী 'চোগিয়ালের' বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায়। এমতাবস্থায় 'র' পুরোপুরি মাঠে নামার সবুজ সংকেত লাভ করে। (এটা জানা যায়, 'র'-এর ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপারেশন শুরু করার কথা জানতে পেরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আশ্চর্য হয়ে যান)।

ঘ। নেতাদের হত্যা ষড়যন্ত্র (Conspiracy to Murder Leaders)

ক্রমান্বয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনায় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে; 'চোগিয়ালের' অপসারণ ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে অনুষ্ঠিত গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ 'হ্যাঁ' ভোট প্রদান করায় ষড়যন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হয় এবং 'সোনম শেরিং' (নিযুক্ত খুনি) এর গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে তা আরো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। জিজ্ঞাসাবাদে সোনম শেরিং স্বীকার করে, 'সিকিম গার্ডস গ্রুপের' ক্যাপ্টেন সোনাম ইয়ংদা তাকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ছয়শত টাকা দিয়ে বিখ্যাত নেতাদের হত্যার জন্য নিযুক্ত করেছিল। ক্যাপ্টেন ইংয়দা পূর্বে 'চোগিয়ালের' এ ডি সি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন ও সম্প্রতি চোগিয়ালের সফরসঙ্গী হিসেবে নেপাল সফর করেন। ক্যাপ্টেন ইয়ংদাকে অতঃপর সিকিমের ২ কি. মি. দূরে উত্তর সিকিমের একটি রাস্তা হতে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের কাছে দেয়া স্বীকারোক্তিতে ক্যাপ্টেন ইয়ংদা উল্লেখ করেন, বিখ্যাত নেতাদের হত্যা ষড়যন্ত্রের মূল হোতা 'চোগিয়াল' স্বয়ং এবং দু'মাস পূর্বেই এ সবের পরিকল্পনা করা হয়। সিকিমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ সব গুপ্তহত্যা ঘটনানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং পরিপূর্ণ সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধানে একই সাথে বোমা বিস্ফোরণ, লুটতরাজ ও আগুন লাগানোর ব্যবস্থাও করা হয়। ক্যাপ্টেন ইয়ংদা আরো প্রকাশ করেন যে, 'মি. এম, রাসাইল' (সাময়িকভাবে বরখাস্ত অডিটর জেনারেল ও প্রেস সেক্রেটারি) ও 'সিকিম গার্ডসের' অ্যাডজুটেন্ট 'ক্যাপ্টেন রাওলান্দ চেটরি' এ পরিকল্পনা সম্পাদনে জড়িত এবং গ্যাংটকের জন্য বারোজন ও বাকি সিকিমের জন্য আটজন এজেন্টকে তাঁরা নিয়োগ করেন।

'সিকিম গার্ডস' থেকে নেয়া অস্ত্র গোলাবারুদ এজেন্টদের সরবরাহ করা হয় ও 'মি. রাসাইল' অগ্রিম ২০০০.০০ টাকাও তাদের প্রদান করেন। তিনি অন্তর্ঘাতী কাজের জন্য কলকাতা থেকে বিস্ফোরক নিয়ে আসেন। জরুরি অবস্থায় সিকিম হতে পালানোর জন্য ভুয়া কাগজপত্রও তাদের সাথে দেয়া হয়।

'ক্যাপ্টেন ইয়ংদার' স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার চারদিন পর পুলিশ 'চোগিয়ালের' প্রাসাদে অস্ত্র, গোলাবারুদ বোঝাই একটি গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধান পায়। এ সব অস্ত্রশস্ত্র সরকারি অস্ত্রাগার থেকে অপসারিত বলে প্রমাণিত হয়। (যদিও 'চোগিয়ালের' ব্যাখা ছিল যে, এ সব অস্ত্র যাতে মন্দলোকের হাতে না পরে সে জন্যই তিনি তাঁর গুপ্তভাণ্ডারে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন যা সরকার 'চরম মিথ্যাবাদিতা' বলে নাকচ করে দেয়)।

ঙ। 'র'-এর বাধা প্রদান (RAW Counteracts)

'র' অপারেটররা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। দেশে একটি পবিরর্তন ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা 'র' এজেন্টদের সবচেয়ে বেশি সাহায্যে আসে। 'চোগিয়াল' অপসারণ ও সিকিমের ভারত ভুক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদেশী প্রচারণা 'র' এজেন্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল জনগণের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। *মূলত: এই কারণেই এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নেপালী, পঁচিশ হাজার লেপচা, তেইশ হাজার ভুটিয়া ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের মিলিত সিকিমে 'চোগিয়াল'কে অপসারণ করার মতো একটি অতি প্রচলিত ধারণাকে উস্কে দেয়া 'র'-এর জন্য কোনো কঠিন কাজই ছিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্বাচিত নেতাদের 'চোগিয়াল' বিরোধী এ প্রচার আরো জোরদার করার জন্য বলা হয় এবং এ জন্য নির্দিষ্ট তহবিল এমনকি ঝুঁকি ভাতা'র (Danger Money) ব্যবস্থাও করা হয়।*

'র'-এর সূত্র মতে, সি আই এ'র সিকিম নিয়ে তৎপরতা ও 'চোগিয়ালের' হোপ কুক নামের আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করা একই সময়ে ঘটা দুটো ব্যাপার। এদিকে জনরোষ ও বিক্ষোভ দিন দিন বাড়তেই থাকে এবং অবশেষে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে 'চোগিয়াল'কে রক্ষার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ১৯৭৩ সালের ৮ মে 'চোগিয়াল' 'একজন এক ভোটের' নীতিতে প্রতি চার বছর পরপর নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদ সমন্বয়ে একটি জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সাংবিধানিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭৪-এর ২৩ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 'সিকিম স্টেট কংগ্রেস' , 'সিকিম ন্যাশনাল পার্টি' ও 'প্রজা সম্মেলন' এ নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী 'সিকিম স্টেট কংগ্রেস' ৩২টির মধ্যে ৩১টি আসন দখল করে এবং 'কাজী লেন্দুপ দোর্জির' নেতৃত্ব গ্রহণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সিকিম জাতীয় পরিষদ ভারতের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা ঘোষণা করে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সহযোগিতামূলক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করে। সিকিম জাতীয় পরিষদের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতীয় পার্লামেন্টে সিকিমকে সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণের জন্য সাংবিধানিক সংশোধনী ১৯৭৪ (৩৬তম সংশোধনী) গৃহীত হয়। কিন্তু এ সব কিছুই পরিস্থিতির পরিবর্তনে কোনো বিশেষ ভূমিকা রাখেনি, বরং 'চোগিয়াল' ও জাতীয় পরিষদের মধ্যে আরেকটি সংঘর্ষ আসন্ন বলেই অনুমিত হয়।

চ। গণভোট (The Referendum)

১০ এপ্রিল ১৯৭৫, সিকিম জাতীয় পরিষদে পাসকৃত এক প্রস্তাবে বলা হয়, "এখন হইতে 'চোগিয়ালের' পদ বিলোপ করা হইল ও এই মুহূর্ত হইতে সিকিম ভারতের সাংবিধানিক অংশ হিসেবে পরিগণিত হইবে"। *এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজী*

লেন্দুপ দোর্জি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী 'ইন্দিরা গান্ধীকে' এ ব্যাপারে অবহিত করেন ও তিনি স্বয়ং দিল্লি গিয়ে 'ইন্দিরা গান্ধী' ও ভারতীয় প্রেসিডেন্টকে জাতীয় পরিষদে গৃহীত বিলের পূর্ণ বিবরণ পেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। লেন্দুপ দোর্জি ভারতীয় সরকারকে আরো অনুরোধ করেন, "অবস্থাভেদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের", যাতে এই সিদ্ধান্তকে নির্বিঘ্নে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে পরিণত করা যায়। বিশেষ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর ৬০% ভাগ এই ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠানের পক্ষে মত প্রদান করেন।

সিকিমের এরূপ কোলাহলপূর্ণ পরিস্থিতি ও তদনুযায়ী গৃহীত ভারতীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবনের বিবৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে তিনি বলেন, "আমি সম্মানিত সংসদ সদস্যগণকে সিকিমের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে চাই"...

"যেহেতু এই সংসদ অবগত আছেন যে, ভারতীয় সরকার- ৮ মে ১৯৭৩-এর চুক্তি ও সিকিম সরকারের ১৯৭৪ সালের বিধান অনুযায়ী, যা গণতন্ত্রসম্মতভাবে সম্পাদিত বলে ধারণা করা যায়, সেই মতে সিকিমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন"।

"উভয় চুক্তিতেই 'চোগিয়াল' ও সিকিমের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মতি ও সমর্থন রয়েছে। যা হোক, একদিকে একটি সাংবিধানিক উপায়ে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার ও অন্যদিকে সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে 'চোগিয়ালের' মর্যাদা নির্ধারণ করেই সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছিল, যার সফলতা পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল 'চোগিয়ালের' সদিচ্ছা ও এ চুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁর একচেটিয়া ক্ষমতাভোগের পরিসমাপ্তি হবে, যা তিনি গত দুই দশক হতে ভোগ করে আসছেন।"

"সম্মানিত সাংসদগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে, বিগত ২০ বছর ধরে সিকিমের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনগণ বিভিন্ন সময় ভারতীয় সরকারকে 'চোগিয়াল' পদের বিলুপ্তির জন্য অনুরোধ করে আসছেন। ভারতীয় সরকারের এ পর্যন্ত লক্ষ্য ছিল এই পদটিকে রক্ষা করার, যদিও বর্তমানে রাজা শাসিত রাজ্যগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর 'রাজ আদেশ' ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের গৃহীত ব্যবস্থা ছিল একটু অন্যরকম, যেখানে আমরা 'চোগিয়ালের' প্রতি একটু বিশেষ ছাড় দিয়েছিলাম এ আশায় যে, তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। এমতাবস্থায় বর্তমান সিকিম সরকার ও জাতীয় পরিষদ যা 'একজন এক ভোটের' ভিত্তিতে একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা চোগিয়ালের পদটির বিলুপ্তি চান এবং বিগত কয়েকমাস ধরে তাদের এই দাবির পুনরুল্লেখ করেন। গত বছর সেপ্টেম্বরের শুরুতে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, যদি সিকিমে গণতন্ত্রকে টিকে থাকতে হয় তবে চোগিয়ালকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা ধৈর্য্য ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এ আশায় যে, চোগিয়াল সাংবিধানিক দায়িত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট

থাকবেন ও আরো অধিক দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিবেন। যা হোক, আমরা চোগিয়ালকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, যখন আমরা চোগিয়ালের পদ রক্ষার্থে বিগত কয়েক বছর ধরে উদ্বিগ্ন, তখন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ জনগণ ও তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ রক্ষা করা প্রথম ও প্রধান আবশ্যিক দায়িত্ব। আমাকে অবশ্যই বলতে হবে, সিকিমের বর্তমান পরিস্থিতি একটি উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে।"

"যদিও, নতুন ব্যবস্থা প্রয়োগের দিন থেকেই চোগিয়ালের বিবৃতি ও কার্য হতে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি শুধুমাত্র তার সাংবিধানিক দায়িত্ব নিয়ে সুখী নন ও এই বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধা দিতে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন।"

"গত কয়েক মাস যাবত সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর মন্ত্রীবর্গ ও সাংসদগণ ভারতীয় সরকারের নিকট দাবি পেশ করেছেন যে, যে পর্যন্ত 'চোগিয়াল' পদটি বর্তমান থাকবে ততোদিন পর্যন্ত সিকিমে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হবে। আমরা সিকিমের রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে ধৈর্য্য ধারণের পরামর্শ প্রদান করেছি কারণ আমরা আশা করেছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত 'চোগিয়াল' সিকিমের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ ও মঙ্গল চিন্তা করে সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস এই যে, এ সব আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। চোগিয়ালের বিগত কয়েকমাসের কার্যক্রম সরাসরি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এবং সিকিমের নির্বাচিত নেতৃত্ব এ সবের দৃঢ় প্রতিবাদ করছেন ও ন্যায়সঙ্গতভাবে গণতন্ত্রের স্থায়িত্বে কয়েকমাস পূর্বে চোগিয়ালের স্বাক্ষরিত ও প্রচারিত 'সিকিম এ্যাক্টের' বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। নেতৃবর্গের এ সব দাবি প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে দাবিয়ে রাখা হয়, যাতে চোগিয়াল নিজে ব্যাপৃত ছিলেন অথবা প্রকাশ্যে উস্কানি দিয়েছেন। ভারতীয় সরকার অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে গত কয়েক সপ্তাহ যাবত লক্ষ্য করছেন যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো, সরকারের কার্যাবলীতে বিঘ্ন সৃষ্টি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ধ্বংস সাধনের জন্য সিকিমের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও সাধারণ জনগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রস্ত করা, এমনকি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে (লেন্দুপ দোর্জি) বিস্ফোরকের সাহায্যে হত্যার প্রচেষ্টা হয়েছে, চোগিয়ালের উপস্থিতিতেই তাঁর একজন পারিষদ কর্তৃক নিরস্ত্র সাংসদকে ছুরি মারা হয় এবং আরো অনেক হতাশাব্যঞ্জক তথ্যাদি নির্বাচিত সাংসদগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনার অল্প কয়েকদিন পূর্বে জানতে পারা যায়।"

"চোগিয়াল ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি গত সপ্তাহে সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পররাষ্ট্র সচিবকে গ্যাংটক যাবার নির্দেশ প্রদান করি। বিশেষ করে পররাষ্ট্রসচিব 'চোগিয়ালকে' সন্তুষ্ট করতে সবিশেষ চেষ্টা করেন। আমরা সব সময় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ধৈর্য্য ধারণ করার সনির্বন্ধ অনুরোধ করে এসেছি এই আশায় যে, চোগিয়াল সরকারের সাথে দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সহযোগিতা করবেন। কিন্তু যদি সরকারকে কাজ করতে বাধা দেয়া হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

অপমান করা হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা অব্যাহত থাকে, তবে পরিস্থিতি জটিল সমস্যায় রূপ দিতে পারে। এই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে।"

"ক্রম অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জনপ্রতিনিধিদের ওপর আসন্ন হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী অতিসত্বর সিকিম গার্ডসকে নিরস্ত্র ও নিষিদ্ধ করার জন্য আমাদের জরুরি অনুরোধ জানিয়েছেন। এমনকি এটার পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নিকট প্রস্তাব করেছেন যে, তিনি জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা কয়েকশ সশস্ত্র ব্যক্তিকে শুধুমাত্র চোগিয়ালের একান্ত ব্যবহারের জন্য সমর্থন করতে পারেন না। সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ আপনারা অবশ্যই এটা মেনে নেবেন না যে, চারশত ব্যক্তিগত সশস্ত্ররক্ষী 'চোগিয়ালের' আওতাধীনে রাজপ্রাসাদে থাকবে কিন্তু তাদের ভরণ-পোষণ করা হবে জনগণের টাকায়। মুখ্যমন্ত্রী (লেন্দুপ দোর্জি) ও তাঁর সহকর্মীগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সফল করার চেষ্টায় সিকিম গার্ডসের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যা ভারতীয় সরকারকে আরো জরুরি ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন বিবেচনার তাগিদ দিয়েছে। কারণ সিকিমের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ভারত সরকারের দায়িত্ব। সরকার ৯ই এপ্রিল বিকালে সিকিম গার্ডসকে নিরস্ত্র করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শেষ করার পূর্বে আমি সিকিমের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের আরেকটি দাবির উল্লেখ করতে চাই যা তাঁরা বিভিন্ন সময়ে ও বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে পূনঃপুনঃ করে আসছেন। তা হলো যে, নির্বাচিত সরকার হিসেবে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব হচ্ছে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে সাংবিধানিক অংশ হিসেবে সমমর্যাদা লাভের ইচ্ছা। এই অনুরোধ ভারতীয় জীবনধারার মূলস্রোতের সাথে পুরোপুরি অংশগ্রহণের জন্য সিকিমের জনদাবি, যা উৎসারিত হয়েছে ঐতিহ্যগত ভাবালুতার সচেতন প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে। এখানে আবারো উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, সিকিম গণপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ১০ এপ্রিলের বিধান মতে 'চোগিয়ালের' পদ বিলোপকরণ দাবীর যথার্থতা সম্পর্কে ভারতীয় সরকার গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন"। (এশিয়ান রেকর্ডার, মে ২১, ১৯৭৫)। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় সংসদ ২৬ এপ্রিল ১৯৭৫ সালে সিকিমকে ভারতের ২২তম প্রদেশ রূপে গ্রহণের জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল (৩৮তম সংশোধনী) পাস করে। 'র' একটি 'রাজা শাসিত' রাষ্ট্রকে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রদেশে পরিণতকরণে এভাবেই সাহায্য করেছিলো। 'চোগিয়াল' রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্মূল করে সিকিমে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনে কতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন তা এখনো রহস্যই রয়ে গেছে। এতো সবের পরেও অবস্থা বিশৃঙ্খলই রয়ে যায়। একদিকে যে কোনো মূল্যে 'চোগিয়ালের' পদ রক্ষার জন্য বিদেশী এজেন্সিগুলো ও কায়েমি স্বার্থবাদীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে আর অন্যদিকে অবস্থান নেয় জনসমর্থিত নির্ভীক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। 'র'-এর দু'পক্ষের মাঝে হস্তক্ষেপ করে এবং সাফল্যের সাথে জনস্বার্থ পরিপন্থী পরিকল্পনার মোকাবেলা করে।

চার বছর পরেও 'র' সিকিমে গণতন্ত্রায়নে বাধাদানকারীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনে ব্যস্ত ছিল। তখনও কিছু কিছু স্থানীয় নিয়োগকৃত এজেন্টদের পয়সা দিয়ে পুষতে হয়। তারা

'র'-এর সাথে জড়িত থাকায় সিকিমকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ২২তম প্রদেশ হিসেবে পরিপূর্ণভাবে যুক্তকরণে বিশেষ সুবিধা হয় ও তাড়াতাড়ি গণতন্ত্রায়নের কাজ সমাপ্ত হয়। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে, কংগ্রেস সরকরের পতন ও জনতা দলের ক্ষমতা গ্রহণের কারণে এ সব স্থানীয় এজেন্টদের নতুনভাবে টাকা বরাদ্দ করতে দেরি হয়ে যায় এবং শেষে জনতা দলের (প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর বিশেষ অনাগ্রহের কারণে) ক্ষমতাকালীন এ ক্ষেত্রে কোনো নতুন টাকা বরাদ্দ করা হয়নি।

এভাবেই 'র'-এর সিকিমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য পরিচালিত 'অপারেশন সিকিমের' ইতি ঘটে। 'র' এজেন্ট ও অন্যান্য যারা এ ব্যাপারে জড়িত ছিল তাদের সকলের কার্যাবলী 'র' দপ্তরে 'অতি গোপনীয়' হিসেবে রক্ষিত আছে এবং রক্ষিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার তা জনসমক্ষে প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন। তবে এটা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, বিভিন্ন বিদেশী সংস্থার গণতন্ত্রায়নে বাধা দান প্রক্রিয়া 'র'-এর সঠিক সিদ্ধান্তের কারণে মুকুলেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

অধ্যায় : ৮

পারমাণবিক অনুমোদন

The Nuclear Sanction

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা প্লুটোনিয়াম প্ল্যান্টের কার্যক্রম শুরু করার চার বছর পর ১৯৬৮ সালে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্লুটোনিয়াম জমানো সম্ভব হয়। 'বিক্রম সারাভাই' তখন ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন ও প্রধানমন্ত্রীকে পরীক্ষা শুরু করার পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সহকর্মীদের সাথে আলোচনার পর এ ব্যাপারে 'এগিয়ে যাবার' সবুজ সংকেত প্রদান করেন। এরপরই 'পূর্ণিমা প্রকল্প' অনুমোদিত হয়। নিরাপত্তার প্রয়োজনে উক্ত প্রকল্পকে 'ছদ্মাবরণে' ঢেকে রাখা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তাই 'নিরাপত্তার শক্ত বাঁধনে বেঁধে রাখার' জটিল কাজটি 'র'-এর ওপর বর্তায়। এভাবেই 'র' প্রথমবারের মতো ভারতের অভ্যন্তরে এরূপ একটি প্রকল্পের কাজে জড়িয়ে পড়ে।

ক। পূর্ণিমা (Poornima)

প্রধানমন্ত্রীর 'এগিয়ে যাও' আদেশ থেকে শুরু করে পূর্ণিমা 'প্রকল্পের খরচ' কখনই প্রকাশ করা হয়নি। এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয় খরচাদি মাদ্রাজের নিকটবর্তী কালপাক্কাম-এ অবস্থিত পরীক্ষামূলক 'ব্রিডার রি-এ্যাক্টর'-এর বাজেটের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়। যে সব সংবাদ শিকারি এ সংক্রান্ত কোনো অস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের খুব সুন্দর ও উজ্জ্বল 'হ্যান্ড আউট' প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য হতে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়। ওই সব হ্যান্ড আউটগুলো তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করে যে, 'পূর্ণিমা' প্রকল্প আসলে 'ব্রিডার রি-এ্যাক্টর' প্রকল্পের একটি অংশ মাত্র। 'র'-এর পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন 'কর্ম গ্রুপে' এমনভাবে বিভক্ত করে রাখা হয়, যাতে তাঁরা একে অপরের সাথে কচিৎ কখনো যোগাযোগ করতে পারেন এবং এভাবে এই পদ্ধতিতে নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হলেও তা হবে সহনীয় পর্যায়ের কম মাত্রার। 'র'-কে এরূপ প্রাথমিক কাজ করার জন্যই ডেকে আনা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 'সম্পূর্ণ নিরাপত্তা' নিশ্চিত করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

১৯৬৪ সালের শেষদিকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 'হোমি ভাবা' তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন, যেখানে তিনি দৃঢ়চিত্তে উল্লেখ করেন, *'ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীরা আর মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে একটি পারমাণবিক বোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হবেন'*। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা 'পারমাণবিক জ্বালানী চক্রের' প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ততোদিনে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। অন্যকথায়, ভূ-তাত্ত্বিক খনিজ ও ক্যামিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা সকলেই বিহারের জাদুগুদায় ইউরেনিয়াম উত্তোলনের শুরু থেকেই জ্বালানী

উৎপাদনের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বলেই ধরে নেয়া যায়। ধাতুবিদরা 'ট্রোম্বেতে' প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হায়দরাবাদের জ্বালানী সামগ্রীর কথা সম্যক অবহিত ছিলেন। পারমাণবিক প্রকৌশলীরা ইতোমধ্যে তিনটি 'রি-অ্যাক্টর' (Apsara, Cirus S Zerlina) সচল করার জন্য তাদের নিজস্ব 'হেভি ওয়াটার প্রকল্প' তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। পারমাণবিক রসায়নবিদগণ ফরাসী সহায়তায় 'ট্রোম্বে'তে একটি 'প্রোটো টাইপ' প্লুটোনিয়াম বিযুক্তকরণ প্রকল্প তৈরি ও চালু করতে সমর্থন হন। এই সাফল্যকে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও আকর্ষণীয় সাফল্য বলে ধরে নেয়া যায়, কারণ এর মাধ্যমে ভারতীয় প্রকৌশলী ও বৈজ্ঞানিকদের অতি উঁচুমানের জটিল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে অভ্যন্তরীণ সাফল্য অর্জিত হয়।

১৯৬৪ সালের পর কানাডার সরবরাহকৃত দু'টো রি অ্যাক্টর ভারতের পশ্চিমে রাজস্থানে নির্মাণ করার সময় বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। কানাডীয়দের উৎসাহে এই সব রি-অ্যাক্টরের অনেক যন্ত্রাংশ পুরোপুরি বা আংশিক পর্যায়ে ভারতে তৈরি করা হয়। এ ধরনের পদক্ষেপ দেশজ পারমাণবিক প্রক্রিয়ার দ্রুত বিস্তৃতি ঘটায়। এর সাথে অনুঘটক হিসেবে বিভিন্ন বেসরকারি প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান যেমন 'লারসন টার্বো (ইন্ডিয়া) লি.', 'মূলচান্দ নাগর লি.', ও 'ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লি.', বিশেষ সাহায্যে এগিয়ে আসে। লব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে 'অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের' অন্তর্গত 'পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন' (PPED) ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার হতে ১২০ টন ওজন সম্পন্ন অ্যালয় স্টিলের তৈরি 'রি-অ্যাক্টর শিল্ড'-এর দরপত্র আহ্বান করতে সমর্থ হয়। (India's Nuclear Bomb, Shyam Bhatia, Vikas 1979)

১৯৭০ সালে রি-অ্যাক্টর তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসে। এ সময় সরকারের পারমাণবিক কৌশলের একটি কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট অবয়ব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে। এ ধরনের প্রথম সংবাদ প্রকাশিত হয় 'সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়। ওই সংবাদ সূত্রে দাবি করা হয়, ১৯৭০ সালের ২৫ জানুয়ারি পারমাণবিক বোমা তৈরির খরচাদি তদারকের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সংবাদকে অনুসরণ করে ২৫ মে '৭০ সালে মাদ্রাজের 'দি হিন্দু' পত্রিকায় 'পারমাণবিক কথকতা' (A Nuclear Profile) শিরোনামে আরেকটি ফলোআপ সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকায় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ১৯৮০ সাল নাগাদ ২৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক শক্তি ও ১৯৭৪ সালের মধ্যে ভারতে প্রস্তুত উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এরপর বিভিন্ন ধরনের অনুমান নির্ভর গল্প বাইরে চালু হয়ে যায়।

ভারতের পারমাণবিক যন্ত্রপাতি ক্রয় সীমিত থাকায় 'র'-এর স্পেশাল ডেস্কের জন্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও বিদেশী গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের মধ্যে অনুমান নির্ভর কল্পনাতে ইন্ধন জোগাতে সুবিধা হয়। যখন তাৎক্ষণিকভাবে কোনো স্থানীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা পাওয়া যেত না, তখন 'র'-এর মাধ্যমে স্থানীয় প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হতে বাছাই করা

প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের অত্যন্ত কঠিনভাবে বেঁধে দেয়া সময়সূচি অনুযায়ী কানাডায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পাঠানো হতো। কানাডায় প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা জ্বালানী প্রযুক্তি সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ লাভের পর অত্যন্ত উপযোগী বলে প্রতীয়মান হন।

এর অনেক পরে, বিদেশেও অফিস আছে এমন কিছু সংস্থা হতে, 'র'-এজেন্ট হিসেবে কিছু লোককে নিয়োগ করে। *এ সব এজেন্ট সুনির্দিষ্টভাবে, বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ দক্ষতা সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সমর্থ হন। সে সময় 'র' ধারণা করে যে, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিশেষ দক্ষতা ছাড়াও পাকিস্তান ১৯৮৫ সালের পূর্বে কোনো পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হবে না।*

ভারতে সে সময়ে স্থানীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত ইউরেনিয়াম তৈরি সম্ভব ছিল না। অবশ্য এখন পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। তাই পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রযুক্তিতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য প্লুটোনিয়ামের ওপর সার্বিকভাবে নির্ভর করতে হয়। ১৯৬৪ সালে 'Cirus' প্রকল্পে ১০ কেজি প্লুটোনিয়াম (বছরে ২টি পারমাণবিক বোমা তৈরিতে যথেষ্ট) উৎপাদন সম্ভব ছিল, অবশ্য বাস্তবে 'Cirus' প্রকল্পে কিছু সমস্যা দেখা দেয়ায় উৎপাদন ক্ষমতার কম পরিমাণ প্লুটোনিয়াম তৈরি হচ্ছিল। ১৯৬৮ সালের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রকল্পের পাশাপাশি আরেকটি বৃহৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যায়।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর এ 'Implosion' পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পদ্ধতিতে বোমার প্লুটোনিয়াম জাত অংশকে রাসায়নিক বিস্ফোরক দ্বারা বাইরে ঢেকে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রযুক্তিতে রাসায়নিক বিস্ফোরণ প্লুটোনিয়ামকে চাপ প্রয়োগ করে যার ফলশ্রুতিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটার জন্য প্রয়োজনীয় 'চেইন রি-অ্যাকশন' শুরু হয়ে যায়। এবার অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগের ও 'র'-এর লোকজন একত্রিত হয় পরবর্তি ধাপের জন্য (র-এর লোকজন পোখরান টেস্টের নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল)। উল্লেখ্য, এই পর্যায়ে ভারত 'আংশিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে' একজন স্বাক্ষরদাতা হিসেবে থাকায় যে কোনো পরীক্ষা চালানোর ক্ষেত্র হলে তা ভূ-গর্ভে চালানো আবশ্যক ছিল।

খ। নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি (Tight Security Wraps)

'র'-এর আরোপিত 'যার যতটুকু জানা প্রয়োজন' দর্শনের ফলশ্রুতিতে পারমাণবিক প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি উচ্চপর্যায়ের গুটিকয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এঁরা হলেন - প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগের সচিব ও অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান 'হোমি সেথনা' (যিনি ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে ড. সারাভাই মারা যাবার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন), পারমাণবিক পদার্থবিদ ড. রাজা রামান্না (তিনি ট্রোম্বের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের প্রধান পারমাণবিক পদার্থবিদ ছিলেন), ড. পি কে আয়েনগার ও 'র'-প্রধান আর এন কাও।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য

বিভিন্ন দলকে নিয়োজিত করেন। পৃথকভাগে বিভক্ত এই দলগুলো শুধু পরীক্ষা শুরুর কিছু পূর্বে পরীক্ষা স্থলে গিয়ে জড়ো হয়। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী আর্মি ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দলকে জানুয়ারি মাসের কোনো এক সময় পরীক্ষা স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ধরনের সেনা তৎপরতাকে যে কোনো পর্যবেক্ষকই নিয়মিত সাধারণ কোনো মহড়ার জন্য সেনা চলাচল বলে মনে করবেন। তবে আর্মি ইঞ্জিনিয়ারদের এ তৎপরতার সাথে 'পোখরান' পরীক্ষার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

১৯৭৩-এর মার্চ মাসে রাসায়নিক বিস্ফোরক ব্যবহার করে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের জঙ্গলে একটি নকল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল, পর্যবেক্ষকদের "ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ব্যর্থ হয়েছে"-এ ধারণা দেয়া। 'র' তাদের এই 'ভুল তথ্য' প্রদানের মহড়ায় নিজেরাই আরো বেশি করে ওই ব্যর্থতার কাহিনী প্রচার করতে থাকে। যার দরুন বিদেশী পর্যবেক্ষকরা কিছুটা শান্ত বোধ করার সুযোগ পান।

অন্যদিকে রাজনৈতিক পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রতিদিনের কার্যক্রমের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হতে থাকে। এদিকে গুজব রটে যায় যে, কমিটির মিটিং-এর একটি 'নোট' অসাবধানতাবশত সভাস্থলে ছেড়ে আসা হয়েছে। যার ফলে 'র' এর পরামর্শক্রমে পরবর্তীতে পারমাণবিক গবেষণা সংক্রান্ত সভায় কোনো মন্তব্য রেকর্ড করা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। কেবিনেট মিটিংয়ে পর্যন্ত এ সম্পর্কিত কোনো আলোচনা বন্ধ থাকে। এরপর থেকে সভায় ছেড়ে আসা কোনো কাগজ, টাইপ রাইটার-এর রিবন ও কেবিনেট মিটিংয়ের রিপোর্ট তৈরিতে ব্যবহৃত কার্বন পেপার পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলা একটি 'ধর্মীয় আচার' অনুষ্ঠানের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। ('র'-এ ক্ষেত্রে কঠোরভাবে এই পদ্ধতির অনুশীল করে থাকে)।

গ। পোখরানের বিস্ময় (The Pokhran Surprise)

১৯৭৪ সালের ১৮ মে, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নির্মিত ১৫ কিলোটন ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পোখরান পরীক্ষার খবরাখবর সারা পৃথিবীর পত্রিকায় হেডলাইন নিউজ হিসেবে প্রচারিত হয়, যা বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সম্পূর্ণরূপে হতবাক করে দেয়।

'র'-এভাবেই পরীক্ষার জন্য গৃহীত সকল কার্যক্রমকে সঠিকভাবে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনিতে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

ঘ। অঙ্গীকার (The Commitment)

জওহরলাল নেহরুর জীবদ্দশায় ১৯৬৩ সালে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং ১৯৬৪ সালে চীনের পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনের পর তা আরো দৃঢ় ভিত্তি পায়। কংগ্রেসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে সরকারকে প্রবল চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। শাস্ত্রী যিনি ১৯৬৪ সালের মে মাসে নেহরুর স্থলাভিষিক্ত হন তিনি

পারমাণবিক ক্ষমতার উন্নয়নে অনেকটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে খরচ, বিদেশী দেশগুলোর 'অতি ভঙ্গুর' মনোভাব ও সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি মানসিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। এদিকে ড. হোমিভাবা ১৯৬৫ সালের শেষ দিকে 'মন্ট ব্লাঙ্কে' এক প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত হন। প্লেনের অভ্যন্তরের বিস্ফোরণ যা প্লেনটির মর্মান্তিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তা অনেকের সন্দেহের উদ্রেক করে। এ ক্ষেত্রে স্যাবোটাজের কথাও একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না। ভাবা, যিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পারমাণবিক পদার্থবিদ, তিনি ভারতের জন্য একটি দেশীয় প্রযুক্তিগত পারমাণবিক গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাবে যেখানে পারমাণবিক প্রকল্পগুলোকে পারমাণবিক শক্তির বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে। তবে শান্তি পূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত পারমাণবিক শক্তিকে কখনই সামরিক খাতে পরিচালিত করা হবে না। এ দুটো 'দিক' এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে অবিচ্ছেদ্য যে, পারমাণবিক শক্তি কার্যক্রম প্রকল্পকে অনায়াসেই অস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

১৯৪৬ সালের ২৬ জুনের জনসমাবেশে প্রদত্ত নেহরুর ভাষণ থেকে তাঁর চিন্তা-চেতনা সম্যক উপলব্ধি করা যেতে পারে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন:

"যতোদিন পর্যন্ত পৃথিবী এখনকার মতো পরিচালিত হবে, ততোদিন পর্যন্ত প্রতিটি দেশের একটি যথার্থ উপকরণ থাকবে এবং সে তার নিরাপত্তার খাতিরে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। আমার এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত তার নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়ন সাধন করবে এবং আমি আশা করি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা পারমাণবিক শক্তিকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করবেন। কিন্তু ভারত যদি আক্রান্ত হয় তবে সে অতি অবশ্যই তার ভাণ্ডারে যা কিছু মজুদ আছে তা নিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আমি আশা রাখি যে, সাধারণত ভারত অন্যান্য দেশের সাথে মিলিতভাবে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের বিরোধিতা করবে।"

চৌত্রিশ বছর পরও নেহরুর দিক-নির্দেশনা এখনো কার্যকরী বলেই প্রতিভাত হচ্ছে। বিদেশী ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের খরব সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে তারা অবশ্যই ভারতের পারমাণবিক অগ্রগতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে, যদিও তা নিতান্তই শান্তিপূর্ণ কাজের জন্যও হয়ে থাকে। তাদের এ আড়িপাতায় সাফল্য নির্ভর করে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স সংস্থার কর্মদক্ষতার ওপর ও তাদের সে সাফল্য লাভের শুভ (!) ক্ষণ পর্যন্ত তারা 'আঁতুড় ঘরেই' আবদ্ধ থাকবে।

অধ্যায় : ৯

'র'-এর ভাগবাটোয়ারা

The RAW Deal

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন ভারতে জরুরি আইন জারি করা হয়। এদিকে জন সংঘ দল, সোশালিস্ট পার্টি, বিরোধী কংগ্রেস ও ভারতীয় লোক দল মিলিত হয়ে ১৯৭৭ সালের ২২ মার্চ 'ভারতীয় জনতা দল' গঠন করে, যা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচনে জয়লাভে সক্ষম হয়। এই সব একটির পর একটি ঘটে যাওয়া ঘটনা ভারতীয় বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে নজিরবিহীন পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় ও জনতা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের যাবতীয় ক্রোধ 'র'-কে লক্ষ্য করে নিঃসরিত হয়। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, 'র'-জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ও এই সংস্থাটি 'ইন্দিরা গান্ধীর অনুগত বাহিনী' বা "IG's Strong Trooper" ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সব অভিযোগের পাশাপাশি 'র'-কে ইন্দিরা গান্ধীর জন্য বিদেশে অর্থ প্রেরণের সংস্থা হিসেবেও সন্দেহ করা হতে থাকে। এভাবেই জনতা সরকার তাদের সকল প্রতিশোধ স্পৃহা 'র'-এর বিরুদ্ধে সমবেত করে। এই সবের সাথে সাথেই 'র'-এর ক্ষয়প্রাপ্তি শুরু হয়।

ক। দুর্ভাগ্যজনক মুষ্ঠাঘাত (The Fatal Blow)

এস এন (শংকর নায়ার) : 'র'-লজ্জিত হবার মতো কোনো সংঠন নয়।

এম ডি (মোরারজী দেশাই) : আমি তাই আশা করি।

এম ডি : আমার বিশ্বাস যে, আপনার সংস্থা প্রচুরসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত লোক নিয়োগ করেছে।

এস এন : জ্বি, স্যার। তবে এ সব ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী পুনঃনিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে একেকজন বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত।

এম ডি : এদের প্রত্যেককে সংস্থা থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

এম ডি : আমি বিশ্বাস করি, 'র'-দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জড়িত ছিল।

এস এন : না, স্যার, এ সব সত্য নয়, ওগুলোর সব ছিল বৈদেশিক অপারেশন।

এম ডি : কিন্তু আপনাদের কার্যক্রম অত্যন্ত অমানবিক ও অত্যন্ত অপ্রচলিত।

এস এন : এগুলোর 'র'-এর বৈদেশিক কার্যক্রম স্যার...

এম ডি : এতে অমানবিকতার কোনো কমতি হয় না- অতিশীঘ্রই আপনাদের গৃহীত সকল অপারেশন স্থগিত ঘোষণা করুন।

এস এন : আমরা যদি সে পদক্ষেপ গ্রহণ করি তবে অনেকেই আমাদের ওপর বিশ্বাস

হারিয়ে ফেলবে ও সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

এম ডি : আমার তাতে কিছু যায় আসে না, আপনি সকল অপারেশন স্থগিত করুন ও 'র'-এর লোকবল ৫০% কমিয়ে ফেলুন, আমাদের এতো বড় সংস্থা পোষার কোনো প্রয়োজন নেই, আমাকে আপনি যতো তাড়াতাড়ি পারেন এ ব্যাপারে রিপোর্ট করবেন।

উপরোল্লিখিত আলোচনা, জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পরপর প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ও নবনিযুক্ত 'র' প্রধান কে শংকর নায়ারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। (নায়ার 'র'-প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করার পর লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত আলোচনার সংগঠনের সত্যতা স্বীকার করেন)। এভাবে যে সংস্থাটিকে বহু বছরের কঠিন পরিশ্রম ও একাগ্রতা দ্বারা গড়ে তোলা হয়েছিল, তা মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড রূপ পরিগ্রহ করে। অতি উচ্চমানের মানবিক সম্পদের ২৫% বিনিয়োগ উঠিয়ে নেয়া হয়, আর বাদবাকি যে ৭৫% বাকি থাকে তা এমনভাবে নষ্ট করা হয় যে ওগুলো মেরামতের বা পুনঃনিয়োগের বাইরে চলে যায়।

খ। কাও-এর পদত্যাগ (KAO Quits)

ইতোমধ্যে 'র'-এর শেষ ভাগবাটোয়ারা একটি পূর্ণ অবয়ব পেতে শুরু করে। 'র'-প্রধান আর, এন, কাও-কে জনতা সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপর অনানুষ্ঠানিক ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করা হয়। এরপর যুগ্ম সচিব নায়ারকে ৪ এপ্রিল উক্ত পদ গ্রহণের জন্য আদেশ দেয়া হয়, যিনি এরমাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনায় অত্যন্ত অখুশি ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন, "যে কেউ একটি কার্যকর বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন। মানব মুখের, নাকের মতো এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং ভারত অতি অবশ্যই পরাশক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে।"

দেশের প্রধান নির্বাহীর (প্রধানমন্ত্রী দেশাই) সাথে তাঁর (নায়ার) কথা কাটাকাটির পর নায়ার তাঁর কোনো এক ঘনিষ্ঠ জনকে অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে উল্লেখ করেন, "প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু"। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দকেই রূঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছিলেন।

গ। 'র'-এর পদাবনতি (RAW Downgraded)

শিকার করার জন্য সময়টা ছিল অত্যন্ত উপযোগী এবং উৎসাহী সুবিধাবাদীরা এ জন্য অনেকদিন যাবৎ অপেক্ষা করছিলেন। মোরারজী দেশাই তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের সময় পর্যন্ত সচিবদের সংখ্যাধিক্যের কথা উল্লেখ করেন ও তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনার ইঙ্গিত দেন। এ সুযোগ ছিল অত্যন্ত লোভনীয়, যা ছেড়ে দেয়া যায় না। এ সময় জানা যায়, কেবিনেট সচিব এস এন মুখার্জী 'র' প্রধানের পদমর্যাদা সচিবের সমপর্যায় থেকে নামিয়ে পরিচালক অর্থাৎ অতিরিক্ত সচিবের সমপর্যায়ে পদাবনতি দেয়ার সুপারিশ করেন। এতে এক ঢিলে

দুই পাখি মারার সুযোগ সৃষ্টি হয়, কারণ এ পদক্ষেপের দরুন 'র'-এর ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব হবে ও অন্যদিকে মুখার্জীর আরেকটি উপদেশ অনুযায়ী সিভিল সার্ভিস থেকে কেউ 'র'-এর তদারকির দায়িত্ব নিয়ে-এর তত্ত্বাবধান করবেন (অন্যকথায় তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক হবেন)। দেশাই এর ফলাফল চিন্তা না করেই সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান।

ঘ। নায়ার-এর পদত্যাগ (Nair Resigns)

মুখার্জী একটি দ্বৈত খেলা খেলার ব্যাপারে অত্যন্ত 'জেদী' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

নায়ারকে না রাগিয়ে ও একইসাথে দেশাইকে সন্তুষ্ট রাখার মানসে মুখার্জী নায়ারের অফিসে দেখা করতে যান ও তাঁকে ব্যাখা করেন যে, প্রধানমন্ত্রী কি চান ও তিনি (মুখার্জী) কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে যুদ্ধ (!) করে নায়ারের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। তিনি আরো ব্যাখ্যা করেন যে, এই পদক্ষেপ একদিকে ভালই, কারণ 'র'-প্রধানের পদমর্যাদা নামিয়ে দেয়ার পরও নায়ারের বেতন একই থাকবে এবং তিনি (মুখার্জী) দু'পক্ষের মধ্যে একটি 'বাফার' বা ভারসাম্য বিধানকারী হিসেবে কাজ করতে পারবেন। তিনি নায়ারকে নিশ্চিয়তা দেন যে, নায়ার তাঁর ইচ্ছামতো যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং শুধু তাঁকে (মুখার্জীকে) এ ব্যাপারে জানালেই চলবে।

নায়ার ইতোমধ্যে মুখার্জীর কার্যকলাপ সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা পেয়ে যান এবং মুখার্জী কিসের জন্য এতো জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তা সহজেই বুঝতে পারেন। তিনি মুখার্জীকে জানিয়ে দেন, যদি অন্য কারো মাধ্যমে তাঁর কাছে কোনো আদেশ আসে, তবে তিনি পদত্যাগ করবেন। অন্যদিকে মুখার্জী বেশকিছু সময়ের জন্য ধারণা করেন, নায়ার তাঁর (নায়ার) 'নীতি অনুসরণে একদম শেষ সীমায় পৌছানোর' এক খেলায় মেতে উঠেছেন। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে ভুল অনুমান করেন। নায়ার একজন অত্যন্ত কঠিন বিশ্বাসের মানুষ ছিলেন এবং কদাচিৎ কখনো কাউকে তাঁর মনোভাব বুঝতে দিতেন। তবে যখন তিনি কোনো কিছু বলতেন তখন একজন সাধারণত তাঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনত। যারা তাঁর সাথে কাজ করেছে তাঁদের মাঝে তাঁর সম্পর্ক ওই ধরনের কথা প্রচলিত ছিল।

সব সন্দেহের অবসান ঘটানোর মানসে নায়ার দেশাইয়ের সাথে দ্বিতীয়বারের মতো আলোচনায় মিলিত হন। শোনা যায় যে, ওই আলোচনা চিৎকার চেঁচামেচির প্রতিযেগিতায় পরিণত হয়। নায়ার, মুখার্জীর বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তার ব্যাখ্যা দাবি করে তাঁর ভাষায় 'তাঁর উপরওয়ালা প্রধানমন্ত্রীর' সাথে বৈঠকে সবাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। আরেকবার মুখোমুখি হওয়ায় দেশাই তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন ও কথা বলার পরিবর্তে চিৎকার করতে থাকেন। কিন্তু অল্পকিছুক্ষণ পর তিনি বুঝতে পারেন যে, নায়ার তর্জন গর্জন করার মতো লোক নন এবং তখনি তিনি তাঁর (নায়ার) 'র'-প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে তাঁকে দীর্ঘ ছুটিতে পাঠিয়ে দেন। এরপর দু'জন পরস্পর

করমর্দন করেন ও বিদায় সম্ভাষণ জানান। ভি শঙ্কর, যিনি দেশাই-নায়ার বাক বিতণ্ডার সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁর জীবনে প্রথমবারের মতো একজনকে দেখলেন, যিনি দেশাইয়ের সম্মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখেন।

ঙ। 'র'-প্রধানরূপে সানটুকের দায়িত্ব গ্রহণ (Suntook Becomes RAW Chief)

নায়ারের 'হঠাৎ পদত্যাগ' 'র'-কে 'আঁতুড়ঘরে' নিক্ষেপ করে। ধারণা বহির্ভূত ঘটনায় সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে কেবিনেট সচিবালয় হন্যে হয়ে 'র'-প্রধান পদে একজন উত্তরসূরি খুঁজতে থাকে। ইতোমধ্যে দু'জন প্রতিযোগী তাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠাতে থাকেন। এরা হচ্ছেন অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল নারায়ণ রাও ও জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান এন এফ সানটুক।

এদিকে গুজব ছড়িয়ে যায় যে, মুখার্জী একজন পুলিশ অফিসারকে 'র'-প্রধান পদে নিয়োগ দান করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন (কারণ তাঁর সাথে পুলিশ বিভাগের পূর্ব সখ্য ছিল), অবশ্য এ কারণ ছাড়াও তিনি নারায়ণ রাওকে বাছাই করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি যখন স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন তখন রাও তাঁর অধীনে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে কাজ করতেন, যার জন্য তিনি তাঁর অধীনতা সহজেই মেনে নিবেন বলে মুখার্জী ধারণা করেন। অন্যদিকে দীর্ঘ ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে নায়ার সানটুকের নাম 'র'-প্রধান পদে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেন। এই অবস্থার মধ্যেই সানটুক 'শূন্যস্থান পূরণ' করে ফেলেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি থেকে ছয় বছর পূর্বে কাও (তদানীন্তন প্রধান) সানটুককে 'র'-এ এনেছিলেন এবং তিনি 'র'-এর দর্শনের সাথে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম ছিলেন। কাও-এর মতো, নায়ার তাদের নিজস্ব অবস্থার কথা চিন্তা না করে 'র'-যাতে অসুবিধায় না পড়ে তাই করতে চেষ্টা চালান। সানটুক এমনি একটি সংস্থার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন যা "ইতোমধ্যেই অর্ধেক ক্ষমতা ও লোকবল হারিয়েছে"। এমতবস্থায় তিনি ছিলেন শুধু নামমাত্র "বিভাগীয় প্রধান"। তিনি তাঁর প্রাক্তন দুই পূর্বসূরি অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন বলে জানা যায়। সানটুকের ক্ষেত্রে বলা হতো যে, "তিনি তাঁর নিজের ছায়াকে পর্যন্ত ভয় পেতেন"।

এদিকে ঘটমান পরিস্থিতি সংস্থাকে শুধু রিপোর্ট পত্রাদি তদারকিতে নিপতিত করে। বিশেষ অপারেশন শাখা সম্পূর্ণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোবল কমে যেতে শুরু করে ও সংস্থা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে থাকে। 'র' নেতৃবৃন্দের এখানে বিশেষ করণীয় কিছুই ছিল না। ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সমস্যার মধ্যেও আবার কম পরিচিত শাখা, যেমন এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার ও স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরোতে 'মৃদু অশান্ত অবস্থা' ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যা ইতোমধ্যে 'পুরুষত্বহীন' 'র'-এর দৈনন্দিন পার্থিব কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

চ। 'র'-এর চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি (The RAW Sanctions)

বৈদেশিক গোয়েন্দা ব্যুরোর মনোবল ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে। বাইরে থেকে এই পার্থক্য সম্পর্কে আঁচ করা কঠিন ছিল। এই আমলে 'র'-তে কাজ করেছেন এমন একজনের মতে, "১৯৭৭ সালে আমাদের মনমেজাজ ছিল যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।" যারা এই সংস্থাকে বিশ্বাস করেছিল তাঁরা সকলেই প্রতারিত হয়েছিল ও কেন এমন হলো তা বুঝতে পারেননি।

দেশাই-নায়ার সংলাপের পর 'র'-এর পরিচালনাধীন অনেক বিশেষ অপারেশন, ওগুলোর প্রতিক্রিয়া বিবেচনা না করেই বন্ধ করে দেয়া হয়। মনে করা হয় যে, সরকার অত্যন্ত কঠোর একটি নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। নায়ার 'র' ছেড়ে চলে যাবার আগে দেশাইকে বলেন, "বিদেশে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করার কোনো বৈধ পন্থা নেই", যার উত্তরে দেশাই পাল্টা জবাব দেন, "তাহলে আমার এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি প্রতিষ্ঠানের কোনোই প্রয়োজন নেই।"

কতগুলো বিশেষ অপারেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল তা বলা না গেলেও যেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় সেগুলো তাদের স্ব-স্ব দুঃখের ইতিহাস নিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। এ সব অপারেশন বন্ধ করে দেয়ার পিছনে যতনা ওই সব অপারেশনের প্রকৃতি দায়ী ছিল তারচেয়ে বেশি হচ্ছে 'র'-এর বিরুদ্ধে লালিত আজন্ম বদ্ধ সংস্কার। 'র'-এর চুক্তিভঙ্গের শাস্তি জনতা সরকরের শেষ পরিণতির একটি কারণ-যার দরুন যারা 'র'-এ যুক্ত ছিল তারা প্রতারিত হয় এবং আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকে, কেন?

ছ। প্রথম চুক্তিভঙ্গ (Sanction One)

মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রতারণা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সকাল এগারটা। পূর্ব পাকিস্তানের কোনো এক স্থানে মুক্তিবাহিনীর একজন যুব বিপ্লবী, আড়ম্বরপূর্ণ ও নির্ভীক স্বঘোষিত জেনারেল আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (টাইগার) একটি পাকিস্তানী স্টাফ কারের বনেটে ভারতীয় ২য় মাউন্টেন ডিভিশনের পতাকা লাগিয়ে তাতে চড়ে বসেন।

এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটে বিকাল ৪:৩১ মিনিটে ঢাকায় লে. জে. নিয়াজীর পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণের কিছু পূর্বে। মুক্তিবাহিনী টাঙ্গাইল এলাকা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকার কিছু নির্দিষ্ট এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর পরিকল্পনায় অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করে এবং 'র'-এর সাথে মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকা মুক্ত করতে সমর্থ হয় ও অবশেষে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিব সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। এরপর নাটকীয়ভাবে বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের নিজে চেয়ারম্যান হয়ে বাকশাল গঠন, ১৪ আগস্টের রাতে শেখ মুজিবের মৃত্যু ও খন্দকার মোশতাকের

ক্ষমতাগ্রহণ এবং ৭ নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমানের মোশতাককে হটিয়ে ক্ষমতা দখল (মোশতাককে সরিয়ে ক্ষমতা নিয়েছিলেন খালেদ মোশারফ-অনুবাদক)। এরপর একমাসের ব্যবধানে গণভোট গ্রহণ করা হয়, যাতে ৯৮.৮৭% ভোট পেয়ে জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ নিশ্চিত হয়। টাইগার সিদ্দিকী যিনি দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন। (এখানে লেখক আব্দুল কাদের বানানটি ভুল লিখেছেন, Abdel Kader-অনুবাদক)। তিনি তাঁর সাথে তখনকার 'ক্ষয়প্রাপ্ত' মুক্তিবাহিনীর ১৬,০০০-২০,০০০ সদস্য নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম বঙ্গে এসে আশ্রয় নেন।

জ। প্রতিশ্রুতি (The Promise)

টাইগার সিদ্দিকী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে সব 'র' সদস্যদের সাথে পরিচিত ছিলেন, তিনি পুনরায় সাহায্য ও নিরাপত্তার আশায় তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশে তিনি ও তাঁর লোকজন তখন কালো তালিকাভুক্ত ছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, তাড়াহুড়ো করে জড়ো হওয়া মুক্তি ফৌজের উদ্দেশ্য ছিল 'মুজিববাদকে পুনর্জীবিত' করা। সিদ্দিকী তাঁর তিনজন সঙ্গীসহ দিল্লীতে যেয়ে ধরনা দিতে থাকেন। তাদের চাহিদা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরল প্রকৃতির, যেমন পূর্বের মতো বেরসরকারি গোপন সমর্থন প্রদান ও তাদের পুনঃগঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দান।

ভারতীয় সরকার তাদের দাবিপূরণে সম্মত হন। কিন্তু এর সাথে একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের সীমানা থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং এ পদক্ষেপ শুধু মুজিবের স্বপ্নসাধ পুনর্জীবিত করার জন্য সীমিত সময়ে পরিচালিত হবে। তারা শুধু চরম অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতেই ভারতীয় আশ্রয় স্থান ব্যবহার করতে পারবেন। এ শর্তে মুক্তিফৌজ রাজি হয়ে যায় কারণ বাংলাদেশ রাইফেলস তাদেরকে কচিৎ কখনো আক্রমণ করত এবং প্রায় সময় তারা (বিডিআর) নিষ্ক্রিয় থাকতো বললেই চলে। শেখ মুজিবের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকার পাশাপাশি আরেকটি বিশেষ কারণে তারা মুক্তিফৌজকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন, আর তা হচ্ছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, বাংলাদেশ মিজো গেরিলাদের আশ্রয় দিয়ে চীনাদের প্রশিক্ষণ প্রদনের সুযোগ দিয়েছে এবং কাদের বাহিনীর মুক্তিসেনারা তাদের ধারণায় এ ধরনের তৎপরতাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং 'র'-এর মাধ্যমে সিদ্দীকিকে ভারতীয় সরকারের সাহায্য প্রদান অব্যাহত থাকে। তবে সাথে সাথে, যাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা না হয় সেদিকে পুংখানুপুঙ্খ নজর রাখা হয়।

ঝ। বিশ্বাসঘাতকতা (The Betrayal)

দেশাই সরকারের ক্ষমতারোহণের ফলে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। মুক্তি

ফৌজ সূত্র দাবি করেন, দেশাই সরকার শুধু সমর্থন প্রত্যাহার করেই ক্ষান্ত হননি (ক্ষমতায় আসার তিন মাস পর) বরং সীমান্তে বি ডি আরের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসা ২০০ মুক্তি ফৌজকে বি এস এফের হাতে তুলে দেয়ার পর তাদের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশে বি ডি আরের নিকট হস্তান্তর করা হয় (যদিও তখন মুক্তি ফৌজ 'র'-এর তত্ত্বাবধানে থাকার কথা)। মুসলিম বাঙালিদের দেখা স্বাধীনতা যুদ্ধের হত্যাযজ্ঞ এভাবে আবার সংগঠিত হয়। এসব মুক্তিসেনা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে 'তাদের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করা হবে' সে আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ফিরে এসেছিল। কিন্তু বাস্তবে তাদের বেশির ভাগ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অল্পকিছু সেই গল্প বলার জন্য বেঁচেছিল। এদের মধ্যে বাঘা সিদ্দিকীও ছিলেন।

বাঘা সিদ্দিকী তাঁর 'র'-কন্টাক্ট মেজর মেননের সহযোগিতায় বেঁচে যান। কারণ অন্যান্য অনেকের সাথে তাঁকেও মেজর মেননের অনুরোধক্রমে বি ডি আরের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। বাঘা সিদ্দিকী নিঃসন্দেহে একজন ভাগ্যবান। কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারেন না, কেন তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হলো যা তার মতে বিশ্বাসভঙ্গ বই কিছুই নয়।

৩। দ্বিতীয় চুক্তিভঙ্গ (Sanction Two)

চাকমা মহিলা ও শিশু হত্যাযজ্ঞ ঃ ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে 'নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত থাকায় আরেকটি 'র'-অপারেশন বন্ধ হয়ে যায়।

অপারেশন স্থগিতকরণ ঃ বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তের একদম শেষ পর্যায়ে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থিত সেখানকার চাকমা গেরিলারা মুক্তিবাহিনীর মতো 'র'-অপারেটিভ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিল। চাকমারা ইয়াহিয়া খানের সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই নদীর ওপর একটি বাঁধ তৈরি করে ফলে ওই এলাকার চাকমাদের অন্যস্থানে পুনর্বাসন করা হবে বলে সরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে ওই পুনর্বাসন কখনো করা হয়নি। বরং এর পরিবর্তে সত্তর দশকে বাঙালি মুসলিম জনগণ দরিদ্র চাকমাদের নিকট হতে সহায় সম্পত্তি ক্রয় আরম্ভ করে এবং এর পর ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়াও একই সাথে চলতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চাকমাদের কিছু সময়ের জন্য সাহায্য করা হয়। কিন্তু মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর আবার সেই ধর্মান্তকরণ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যায়। তাই তারা বাধ্য হয়ে সাহায্যের আশায় ভারতে আসা শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর মতোই তারা তাদের পুরনো 'র' কন্টাক্টদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং অবশেষে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়।

আগরতলা অতিক্রম করে এসে তারা দরকষাকষি শুরু করে। তাদের পরিবার-পরিজন ও শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের দাবি ভারত সরকার মেনে নেন। তারা তাদের নিজস্ব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা একটি সংকীর্ণ করিডোরের নিরাপত্তা নিশ্চিত

করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করে যার মাধ্যমে তাদের পরিবার-পরিজন ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এদিকে মিজো সমস্যার আশংকা রয়ে যায় কারণ তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'আশ্রয়স্থান' হিসেবে ব্যবহার করছিল ও চীনারা তাদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিল। চাকমা উপজাতিদের আকার আকৃতি ও চেহারা মিজোদের মতো একই রকম থাকায় ও মিজোরা উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালাবার জন্য অস্ত্রসজ্জিত হওয়ায় প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং লালডেঙ্গা, যিনি ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 'র'-এজেন্টদের সাথে ইউরোপে যেতে সম্মত হন। পরবর্তীতে 'র'-অপারেটিভদের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে তাঁকে দিল্লীতে আনা সম্ভব হয়, যদিও তখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যায়ে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি মাত্রায় সক্রিয় হওয়ার পরিবর্তে মিজো বিদ্রোহীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সরকারকে তথ্য সরববাহের প্রস্তাব দেয় যার পবিরর্তে তারা তাদের পরিবারের জন্য ভারতীয় আশ্রয়ের নিশ্চয়তা চায়। ভারত সরকার এই দাবি মেনে নেন।

কিন্তু আবারো কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই চাকমাদের পরিবারের ভারতে প্রবেশের করিডোর বন্ধ করে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমিক ঘটনা প্রবাহে হতবুদ্ধি হয়ে তারা ভারতীয় পক্ষ ও যে সমস্ত 'র'-এজেন্টদের তারা বিশ্বাস করেছিল তাদের পরবর্তী গৃহীত কার্যক্রমের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তারা যে আশ্রয় চেয়েছিল ও যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল, তা বাস্তবে পরিণত করা হয়নি।

করিডোর বন্ধ করে দেয়ার খবর বাংলাদেশ রাইফেলস্ সদর দফতরে পাঠানো হয় এবং বিডিআর তৎক্ষণাৎ ওই করিডোর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করে। চাকমারা শেষ 'জুয়ার দানে' তাদের মহিলা ও শিশুদের ভারতীয় সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু যখন তারা বিপুলভাবে প্রহরারত সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা চালায় তখন তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বলে খবর পাওয়া যায়। এভাবে বন্ধ করে দেয়া আরেকটি অপারেশনের ভয়ানক মাশুল টানতে হয়েছিল।

ট। তৃতীয় চুক্তি ভঙ্গ (Sanction Three)

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও ওয়ালী খানের অস্বীকার ঃ ১৯৭৩ সালের ১০ এপ্রিল পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ সমন্বয়ে নতুন পাকিস্তান গঠন করা হয়। যাহোক, ১৯৭৭ সালের মার্চের নির্বাচনে জেড, এ, ভুট্টোর বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ব্যাপক কারচুপির জন্য ও বিপরীতে ভুট্টোর পরিস্থিতি মোকাবেলায় অনমনীয় মনোভাবের কারণে পাকিস্তান জুড়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৭৭ সালের ৫ জুলাই সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং আরো একবার পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হয়। অন্যান্য সকল সামরিক

শাসকের মতো জিয়াউল হক সময় সুযোগ মতো পরবর্তীতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন ও বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে আফগানিস্তানে প্রবাসী এক পাকিস্তানী নাগরিক উল্লেখ করেন, "আমরা ১৯৮০-এর শেষপাদে উপনীত হয়েছি কিন্তু সেই পুরনো খেলা এখনো চলছে।" আফগানিস্তান প্রবাসীর এ মন্তব্য একটি সাময়িক, অনিয়মিত সামান্য ব্যাপার হতে পারে কিন্তু নতুন সংবিধান প্রণয়নের পরপর সামরিক শাসন জারির উদ্দেশ্য বোঝা যায় এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হতে বহু লোক পলায়ন করে। এ দলের সাথে ওয়ালী খান ও তাঁর অনুগত রাজনৈতিক সতীর্থরাও আফগানিস্তানে চলে যান ও সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

জেনারেল মোহাম্মদ দাউদ যিনি অল্পকিছুদিন পূর্বে ১৯৭৩ সালের ১৮ জুলাই রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে আফগানিস্তানকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন ও এর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন তিনি পাকিস্তানী শরণার্থী পোষার ও এদের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তথাপি তিনি এদের আফগানিস্তানে থাকার অনুমতি প্রদান করেন এ শর্তে যে, শরণার্থীরা নিজেরাই নিজেদের খরচ চালাবে। এ অবস্থায় ওয়ালী খান সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুব বেশি সময় নেননি।

ঠ। প্রতিশ্রুতি (The Promise)

'র'-অপারেটিভরা ইতোমধ্যে কাবুলে ওয়ালি খানের সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ হয় এবং ওয়ালি খানের আর্থিক সাহায্যের আবেদন তাদের মোটেও আশ্চার্যান্বিত করেনি। আরেকটি ব্যাপার ওয়ালি খানকে ভারতের সাহায্য প্রত্যাশায় উদ্বুদ্ধ করে, আর তা হলো তাঁর সাথে 'সীমান্ত গান্ধী' নামে সমধিক পরিচিত বাদশা খানের গভীর আত্মীয়তা এবং তাঁর (বাদশা খান) সাথে ভারত ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ। সুতরাং আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্তে আসতে বিশেষ সময় লাগেনি। বিরাজমান পরিস্থিতিতে ওই সিদ্ধান্ত ভারত ও আফগানিস্তান উভয়েরই অনুকূলে ছিল।

তবে এবারও ভাগ্য ওয়ালি খানের পক্ষে কাজ করেনি। দেশাই সরকার তৃতীয় একটি দেশে কোনো রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করাকে অত্যন্ত ভীতিজনক বলে বিবেচনা করে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে নায়ারকে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সাহায্য বন্ধের নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে 'র'-এর আরেকটি অপারশনের ইতি ঘটে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, এখানে যদি আদৌ কোনো সত্যতা থেকে থাকে তবে ওয়ালি খান সেজন্য আরো অনেকদিন যাবত ভারতকে বিশ্বাস করা হতে বিরত থাকবেন।

ড। চতুর্থ চুক্তি ভঙ্গ (Sanction Four)

প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান স্থগিত ঃ 'র'-এর শেষ যে চুক্তিভঙ্গ সম্পর্কে জানা যায়, যা নিয়ে দেশাই জনসমক্ষে পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেন, তা হলো 'সিকিম অপারেশন'। যদিও অপারেশন তখনো 'বাতাসে ঝাপটা মারছিল', আর অপারেশনে সাহায্যের বিনিময়ে তখন

পর্যন্ত কিছু সাহায্য প্রদান করার প্রয়োজন ছিল। সে জন্য নতুন করে অর্থ বরাদ্দ জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু নতুন সরকার ক্ষমতায় আসায় ও অনেকটা আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার কল্যাণে দেশাই-এর 'নৈতিক' চিন্তা-চেতনা পূর্বের অপারেশনগুলোর মতো পরিণতি ডেকে আনে। যারা সিকিমে একটি ভয়াবহ রক্তপাত বন্ধ করে সেখানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সাহায্য করেছে তাদের অর্থ প্রদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'র' অপারেটিভরা অত্যন্ত লজ্জার মধ্যে পড়ে যান। এ ব্যাপারে তাদের কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। অবশ্য অন্য কারো বলার মতো কিছু ছিল না।

চ। মাঠ পর্যায়ে বিশ্বাস ভঙ্গ (Loss of Faith in the Field)

এই চারটি অপারেশন নিয়ে 'র'-এর লোকজনের ক্ষোভ ছিল- ছাই চাপা আগুনের মতো। এর সাথে অন্য আরো এই ধরনের ঘটনা ছিল। এটা কোনো সংস্থার নীতি নৈতিকতা বা প্রতিশ্রুতির ব্যাপার নয় বরং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপার, যখন বিশেষ করে কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা না হয়। যে বিষয়টি এখানে প্রথম সারিতে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, তা হলো গণতন্ত্রে চাকরির বাধ্য বাধকতা ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির প্রতি নিবেদিত নয় বরং তাঁর জন্য নির্ধারিত অফিস বা পদের প্রতি অনুগত ও যে কোনো চাকরির উদ্দেশ্যই হলো সরকারি নীতির মধ্যে দেশের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া। একজন সরকারি চাকুরে সব সময়ই একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি (অথবা তাকে তা হওয়া উচিত)। তিনি তার সামর্থানুযায়ী অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সরকারি নীতির অনুসরণে কাজ চালিয়ে যান। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত নীতিমালার ওপর নির্ভর করে তাঁর কাজের দিকনির্দেশ করেন এ বিশ্বাসে যে, তিনি যার জন্য এ কাজ করছেন (বা যার অধীনে) তার পরিবর্তন হলেও ওই কাজের উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় থাকবে। কোনো চাকরির ক্ষেত্রে কেউ তার ওপরওয়ালা যা শুনতে চান বা তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য যে তথ্য চেয়ে বসেন তা সরবরাহ করতে বাধ্য নন।

কিন্তু দেশাই সরকারের শাসনামলে জনগণের জন্য কাজ ও ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে সীমারেখা উপড়ে ফেলা হয় এবং ব্যাপারটি "দাবা খেলার পরিবর্তে দমন পীড়নমূলক খেলায় পরিণত হয়।"

ণ। 'র'-এ ধর্মঘট (Strike in RAW)

এরমাঝে বার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো 'র'-কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে 'এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯৮০ সালের ৫ জুলাই ১৫০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ধর্মঘট পালন করেন। ট্রেড ইউনিউয়নিজম এভাবে 'র'-এর সুরক্ষিত আচ্ছাদিত পথে প্রবেশ করে যা কোন ইন্টেলিজেন্স সংস্থার ইতিহাসে কখনো শোনা যায়নি। 'র'কে নিয়ে ভাঙা গড়ার এ খেলা এভাবেই তার প্রায়শ্চিত্ত করে।

অধ্যায় : ১০

বৈদেশিক নীতিমালা
Foreign Affairs

সকল প্রকার তথ্য, তা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যাই হোক না কেন, তা একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে ও সার্বিকভাবে প্রতিরক্ষানীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। এ দু'টো নীতি নির্ধারণে গোয়েন্দা তথ্যের সুনির্দিষ্ট সহায়তার মাঝে মাঝে সমায়নুযায়ী তারতম্য ঘটে থাকে। সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, আহরিত শতকরা পঞ্চাশভাগ 'ইন্টেলিজেন্স' বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে এবং বাদবাকি পঞ্চাশ ভাগ প্রতিরক্ষা বা রণনীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। এ দুটো ক্ষেত্রের বিশেষ প্রকৃতিই তাদের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্কের সৃষ্টি করে থাকে। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, 'স্টেশন চিফ' বা 'কেস অফিসারের' (অপারেশনের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়) সাধারণ কার্যপ্রণালী, যেখানে তিনি দূতাবাসে, হাইকমিশনে বা কনস্যুলেটের কোনো কর্মকর্তার পরিচয়ের আড়ালে কাজ করে থাকেন, সেখানে তাঁর গৃহীত এই 'আড়াল' (Cover) অপারেটিভদের এসপায়োনেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

'স্টেশন চিফের' কূটনৈতিক কাভার একটি সুনির্দিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য সুবিধাজনক অবস্থান সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতি পৃথিবীর প্রায় সকল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিই অনুসরণ করে থাকে। কূটনৈতিক ছদ্মাবরণ শুধু 'কূটনৈতিক ব্যাগে'র (Diplomatic Bag) সুবিধা গ্রহণেই সহায়তা করে না বরং এমন সব 'নিষিদ্ধ' জায়গায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে, যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। এ সব কর্মকাণ্ডের ফলে অন্যান্য বন্ধুপ্রতিম ও ততোধিক বন্ধুপ্রতিম নয় এমন সব দেশের ইন্টেলিজেন্স প্রধানদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে আলাপ-আলোচনা রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয়ও সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে আলাপ-আলোচনা রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে সংঘটিত আলোচনার নীতিমালা অনুসরণ করে চালিয়ে যাওয়া হয়। সকল দেশই এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে থাকে। পারস্পরিক সুবিধার উপর নির্ভর করে তারা এ ধরনের কার্যক্রম অস্বীকার করে বসতে পারে। 'র' এর সাথে উন্নত ও অনুন্নত উভয় প্রকার দেশের যে সমস্ত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির যোগাযোগ রয়েছে তা কখনই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না। এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়, যাতে 'জন সমালোচনার' পরিস্থিতির উদ্ভব হলে একপক্ষ আরেক পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কথা সহজেই অস্বীকার করার সুযোগ পায়।

সময় বিশেষে একজন রাষ্ট্রদূত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যোগসূত্র উপস্থাপন করতে পারেন। ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এমনও হয়েছে, যেখানে পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী

কোনো একটি দেশের 'স্টেশন চিফ' সমগ্র যুদ্ধাকালীন সময়ে পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স পরিচালকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছিলেন। এর উদ্দেশ্যে ছিল যে, জনসমক্ষে কোনো কিছুর প্রকাশ না ঘটিয়ে, যুদ্ধরত যে কোনো পক্ষ যদি শান্তিপূর্ণ সমাধানে এসে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায়, তবে তার ব্যবস্থা করা। নিয়াজী আত্মসমর্পণে রাজি হওয়ার পর 'র'-এর অফিস হতেই আত্মসমর্পণের চুক্তিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ ধরনের সমন্বয়ের ফলে কনফারেন্স টেবিলে যাওয়া বা রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে সরাসরি উন্মুক্ত বৈঠকি সংঘর্ষের ঝুঁকি এড়িয়ে চুক্তিতে উপনীত হওয়া সহজ হয়েছিল। যদি ইন্টেলিজেন্স চ্যানেলগুলো উন্মুক্ত রাখা যায় তবে এ ধরনের আলাপচারিতা বা সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি তা ব্যর্থ হয়ে যায় (যা যে কোনো সময় হতে পারে) তবুও তাতে হারাবার কিছু নেই।

কোনো কোনো সময়ে যেখানে পরিস্থিতি হয়তো অন্যরূপ জটিল আকার ধারণ করতে পারতো, সেখানে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রস্তুত অবস্থা হতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। এ ধরনের এক ঘটনায় 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' নামে 'এয়ার ইন্ডিয়ার' একটি বিমান হংকং থেকে ম্যানিলা যাবার পথে আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছিল। ওই বিমানটিতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর বান্দুং কনফারেন্সে যাবার কথা ছিল। ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো বিমানে সম্ভাব্য অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার ব্যাপারে আশঙ্কাজনক বেশকিছু খবরা-খবর জানতো। চীনা প্রধানমন্ত্রী ওই ঘটনা ঘটার সময় তাই অন্য বিমানে ভ্রমণ করছিলেন। এ ঘটনায় চীনাদের মনে সম্ভাব্য অন্তর্ঘাতকদের ব্যাপারে বেশ সন্দেহের উদ্রেক করে। আই বি'র বৈদেশিক ডেস্কের একজন কর্মকর্তাকে তাই ঘটনা তদন্ত ও এর পিছনের মূল নায়কদের চিহ্নিত করার জন্য হংকং পাঠিয়ে দেয়া হয়। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ও হংকং পুলিশের সহযোগিতায় আই বি'র কর্মকর্তা অন্তর্ঘাতের কারণ ও এর সাথে সংযুক্ত লোকদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হন। এর পরপর খুব শীঘ্রই তাঁকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ব্যক্তিগত দূত হিসেবে চীনা প্রধানমন্ত্রীর নিকট আসল ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য পিকিং-এ পাঠানো হয়। অন্তর্ঘাতকরা তাইওয়ানী এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়, যারা 'চো-চো' নামে এক চীনাকে হংকং-এর 'কাইটাক' বিমানবন্দরে 'এয়ার ইন্ডিয়ার' বিমান অবতরণের পর বিমানের কার্গো হোল্ডে বোমা পাতার জন্য নিযুক্ত করেছিল। তদন্তের ধারাবাহিকতায় চো চো যখন ম্যাকাও যাবার ফেরিতে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিল তখন সে ধরা পড়ে যায়।

আই বি'র কর্মকর্তার সাথে চৌ এন লাই-এর আলোচনা দীর্ঘ দু'ঘণ্টা পর্যন্ত চলে এবং শেষ পর্যায়ে তিনি চীনা প্রধানমন্ত্রীকে প্রকৃত ঘটনা বোঝাতে সক্ষম হন। তখন এমন একটা সময় ছিল যখন চীন-ভারত সম্পর্ক ছিল কিছুটা 'নাতিশীতোষ্ণ' পর্যায়ের, সেখানে তিব্বতে চীনের সার্বভৌমত্ব ছিল নিরেট বাস্তবতা ও ভারত কোরিয়া নিয়ে চীন-মার্কিন যুদ্ধ এড়ানোর মধ্যস্থতায় নিয়োজিত ছিল। চৌ এন লাই এ সময় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে এম পানিক্কার-এর সাথে সাক্ষাতকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর শান্তি প্রচেষ্টার জন্য

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও এ কথা প্রকাশ করেন যে, মার্কিনিরা ৩৮তম সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করলে চীন-কোরিয়া যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে। এভাবেই যে ঘটনা গোটা পৃথিবীতে সাংঘাতিক এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারতো তা সাফল্যজনকভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

যদিও পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of External Affairs=MEA) খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, 'বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স সংস্থা' ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লোকজনের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা দেশের স্বার্থে একান্ত ভাবে প্রয়োজন তবুও তারা এ ব্যাপারটি ক্রমাগত অবহেলা করে আসছে। এ সমস্যাটি তাদের নিজেদের সাথে নিজেদের ফাঁকি দেয়ার প্রবণতার জন্য তৈরি হয় যেখানে তারা মনে করে যে, এ সমস্ত কাজ কারবার তারা নিজেরাই সহজে করতে পারবেন এবং তারাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। সম্ভবত চীনা ও রাশিয়ানরা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই তাদের দেশের বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে বৈরী আচরণ করে থাকে। এ সমস্যার উৎপত্তি হয় কিছু মনস্তাত্ত্বিক ভাব প্রবণতার জন্য, যেমন কোনো দূতাবাসের পররাষ্ট্র বিভাগীয় লোকজন মনে করেন যে, তাদের সাথে সংযুক্ত ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ তাদের পদদলিত করে অনুপযুক্ত, অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন বা বিনা পয়সায় মদ, ডিউটি ফ্রি গাড়ি ও ডিউটি ফ্রি দোকানের সুবিধা আদায় করে নেন এবং তারা যত্রতত্র মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারেন যা তাদের ক্ষেত্রে অতটা ঝামেলামুক্ত ব্যাপার নয়।

ভারতে এ পরিস্থিতি সাধারণ কারণগুলো ছাড়াও এর থেকে আরেকটু 'খারাপ' পর্যায়ের এবং এর মূল নিহিত হচ্ছে ইতিহাসে। আসল ঘটনা হচ্ছে যে, মূল বৈদেশিক গোয়েন্দা সংগঠন অর্থাৎ আই বি'র বিদেশ সংক্রান্ত ডেস্ক গড়ে তোলা হয়েছিল মুখ্যত পুলিশ বাহিনীর (Indian Police Service বা IPS) সদস্যদের নিয়ে যাদের সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় পররাষ্ট্র ক্যাডারের চেয়ে নীচু শ্রেণীর সার্ভিস বলে মনে করা হতো এবং এ নিয়ে তখন থেকেই অনেকে 'ভ্রূঁ কোচকানো' শুরু করেন। বাস্তবে ভারতীয় পুলিশবাহিনীতে ঢোকা বৈদেশিক সার্ভিসে (IFS) অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সোজা হওয়ায় বৈদেশিক সার্ভিসের লোকজন এ ক্ষেত্রে তাদের প্রাধিকার দেয়া হবে বলে ভেবেছিলেন।

এ ছাড়াও অবশ্য অন্য আরো অনেক কারণের মধ্যে বৈদেশিক সার্ভিসের লোকজনের ঝুলিতে বিভিন্ন কলংকের বোঝা জমা হওয়া ও এমনকি তাদের কেউ কেউ কোনো কোনো সময় ভাসাভাসা ভাবে মস্কোর মতো জায়গাতেও চোরাকারবারে জড়িয়ে পড়াও ছিল অন্যতম।

বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন প্রাথমিক পর্যায়ে আই বি থেকে আসার কারণে বৈদেশিক সার্ভিসের লোকজন ভারতে শুরু করেন যে, তারা (IB) আসলে তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি চালানোর জন্যই নিয়োজিত হয়েছেন এবং ইন্টেলিজেন্স লোকদের দুর্দম

সৎসাহসকে তারা তাদের নিজস্ব সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ বলে ঘৃণার চোখে দেখা শুরু করেন।

এ অন্তর্জ্বালা কখনো কখনো দাবানলের মতো জ্বলে উঠতো, বিশেষ করে যখন 'র' এসপায়োনেজের মূল শাখায় পরিণত হয় এবং মাঠ পর্যায়ে নতুন বিধি বিধান প্রণয়ন করা হয়। 'র'-অপারেটিভদের ব্যবহারের জন্য ভিন্ন কূটনৈতিক ব্যাগ এবং সিলমোহরকৃত রিপোর্টসমূহ নতুন করে 'র' কর্মকাণ্ডের ওপর গোপনীয়তার আলাদা চাদর পরিবেষ্টন করে। নিজস্ব এলাকার বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনা সংক্রান্ত সাধারণ পর্যালোচনা 'র' ও বৈদেশিক অফিস উভয়কেই উচ্চ পর্যায়ে জানাতে হতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'র'-এর প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব চ্যানেলের (দূতাবাস হতে) আমলাতান্ত্রিক লালফিতার প্যাঁচে পড়া রিপোর্ট হতে অনেক দ্রুত দিল্লীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে পৌঁছে যেতো। এটা বৈদেশিক সার্ভিসের লোকজনের জন্য 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'র মতো বিবমিশা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কোনো কোনো সময় 'র'-ও এর পূর্বের প্রতিষ্ঠানে কিছুটা অদক্ষতা ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। পুলিশ ক্যাডার সার্ভিস হতে আসার ফলে এ সংস্থার অপারেটিভরা তখন কূটনৈতিক ধারার জীবনযাপন বিশেষভাবে 'মিশ্রিত শ্রেণীধারার' আবর্তে নিজেদের অপ্রস্তুত বোধ করতেন। অসামঞ্জস্যতা ও ভুলত্রুটিগুলো সহজে চোখে পড়ায় সে অপারেটিভকে লক্ষ্য করে অসহনীয় পর্যায়ের রুক্ষ কৌতুক করা হতো, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে না বুঝেই দেশদ্রোহিতামূলক ভাব প্রবণতাকে উস্কে দিত। হয়ত দেখা যেত যে, অপারেটিভের ছদ্মাবরণ উন্মোচনকারী প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন একজন পেশাদার কূটনীতিক এবং তিনি উন্মুক্ত স্থানে "সাবধান ও একজন গুপ্তচর" এ কথাটি ব্যঙ্গচ্ছলে উচ্চারণ করে ওই 'মহৎ কর্মটি' সমাধা করতেন। "দ্বিতীয় শ্রেণীর কূটনীতিবিদ" অপবাদে অপারেটিভরা সকলের বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত হতেন, কারণ তারা একজন প্রকৃত দক্ষ কূটনীতিকের আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন না।

যখন 'র' গঠন করা হয় এবং এ সংস্থার লোকজন ১৯৬৯ সালে সরাসরি শুধু প্রধানমন্ত্রীর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন তখন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MEA) গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক কায়দায় তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। নতুন পদ্ধতিতে 'র'-এর লোকজন যেখানে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট করত সেখানে বৈদেশিক দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে রিপোর্ট পেশ করতেন, যিনি পরবর্তীতে প্রয়োজনানুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে সে ব্যাপারে অবহিত করতেন। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেও তা ছিল সাময়িক একটি ব্যাপার। পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউলের সাথে 'র'-প্রধান আর, এন, কাও-এর বিশেষ ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি বৈদেশিক অফিসসমূহে বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স শাখার গুরুত্ব অত্যন্ত ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যা তাঁর অধীনস্তদেরও তদনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহ জোগায়। কিছু রাষ্ট্রদূত যারা বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাজ কারবার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তাঁরাও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আপা, বি, পান্থ যিনি ইংল্যান্ড ও ইতালীতে কর্মরত ছিলেন এবং জি পার্থসারথি, যিনি পাকিস্তান ও চীনে নিয়োজিত ছিলেন, এ দু'জনেই 'র' অপারেটিভদের অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন ও তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন অপারেশনে নিয়োজিত

ছিলেন। এ সহযোগিতা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয় ও পান্থ্ এবং পার্থসারথিকে 'র'-অফিসারদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকে। এরূপ আরেকজন উল্লেখযোগ্য কূটনীতিবিদ ছিলেন ডি,পি, ধর যিনি 'র'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা ও উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ধর, কাও ও মানেকশ' 'বাংলাদেশ অপারেশনের' সময় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন।

অন্য যে কোনো চাকরিতে দেশের জন্য ভালো কিছু করার জন্য পুরস্কার ও পদক পাওয়া যায় কিন্তু ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অপারেটিভ ও এজেন্টরা লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকেন ও কোনো পদক তাদের ভাগ্যে জোটে না। তাদের অবদান সকলের অনবহিত থেকে যায়।

বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস সম্পর্কে কিছু রাষ্ট্রদূত ও এ ধরনের কিছু ব্যক্তির স্বভাবগত 'এলার্জি' কিছুদিন চাপা পড়ে থাকে। কিন্তু জনতা সরকারের ক্ষমতারোহনের সাথে সাথে 'র' বিরোধী প্রচারণা পুনরায় তুঙ্গে ওঠে। পুরানো অবচেতন ঘৃণার আগুন প্রজ্বলিত হয়। পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MEA) আবারো 'উল্টো ঘুরে' তাদের মন্ত্রীকে 'র'-এর কার্যক্রম 'অত প্রয়োজনীয় নয়' বলে বোঝাতে সচেষ্ট হন।

'দুই মহারথী'র (কাও এবং নায়ার) বিদায়ের পর দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের আপাত সমাধান কল্পে অনুভূত হয় যে, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের ব্যাপারে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। 'র'-প্রধান একধাপ পদাবনতির পর তাঁর এক হাত পিঠে বাঁধা অবস্থায় কেবিনেট সচিবের কাছে সকল ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করতেন, যিনি বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে বেশিকিছু জানতেন না বলেই অনুমিত হয়। এরপর আবার পটপরিবর্তনের সাথে সাথে নীতিমালার পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৮০ সালের ৯ জানুয়ারিতে কংগ্রেস (আই) সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে পুনরায় সরকার গঠনে সমর্থ হয়।

সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে; পি এল ও কে পূর্ণ কূটনৈতিক মর্যাদা প্রদান করা হয় ও ইয়াসির আরাফাত দিল্লী সফরে আসেন এবং এর দু'দিন পর ১৯৮০ সালের ৮ জুলাই ভারত কম্পুচিয়াকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ উভয় ঘটনা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করায় শীঘ্রই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়, কিন্তু তারপরও অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতকে তার পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর বৈদেশিক দপ্তরের কর্মচারীদের পর্যালোচনার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

অধ্যায় ঃ ১১

গুপ্তচরবৃত্তি কি আদৌ প্রয়োজনীয়?

Is It All Necessary?

"আমাদের অবশ্যই গুপ্তচরদের বিদূরিত করতে হবে, কারণ ওরা শুধু যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে, মানুষকে অপরিমেয় দুঃখ, কষ্টের গোপন ইন্ধনদাতা হিসেবে কাঁদায়।" যারা এ কথা বলেন, তারা ভুল বলে থাকেন, কারণ গুপ্তচররা যুদ্ধের সৃষ্টিকর্তা নয় বরং তারা যুদ্ধের উপজাত সৃষ্টি। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পৃথিবীকে শুধুমাত্র যুদ্ধের একটি উপাদান থেকে মুক্ত না করে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধ থেকে মুক্ত করা। এটা কোনো ছেলে ভোলানো সহজ কাজ নয়। কিন্তু বার্নার নিউম্যান তাঁর ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'দি ওয়ার্ল্ড অব এসপায়োনেজ' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তাঁর মতামতের ইতি টানতে গিয়ে উল্লেখ্য করেছেন যে, একবার যদি কখনো যুদ্ধের ভয়াবহ উপস্থিতি থেকে কোনো মতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তবে 'গুপ্তচর' নামক পেশাজীবী শ্রেণীটিকে অবলুপ্ত করা যেতে পারে এবং তখন তার কোনো প্রয়োজনও নেই।

ইতোমধ্যে তাঁর বই প্রকাশের আঠার বছর (১৯৮১ সালে হিসেবে ধরে আঠার বছর হয়) অতিক্রান্ত হওয়ার পরও 'যুদ্ধ' নামক বিভীষিকাটি দোর্দণ্ড প্রতাপে পৃথিবীতে ভয় প্রদর্শন করে চলছে। স্নায়ু যুদ্ধ বা ছোট খাট যুদ্ধ সারা পৃথিবী জুড়ে অহরহই সংঘটিত হচ্ছে। ভারত নিজেও-এর মাঝে ১৯৬২ সালে চৈনিক আগ্রাসনে, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে এ অধ্যায়ে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে স্নায়ুযুদ্ধ পৃথিবীর শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। আফগানিস্তানে রাশিয়ার উপস্থিতি, চীনের সাথে সীমান্ত বিরোধ, পাকিস্তানের নিত্যনৈমিত্তিক অস্ত্রের ঝনঝনানি, যুদ্ধের ভয়াবহতাকে আমাদের দরজার একদম ওপাশে নিয়ে এসেছে। কোনো কোনো সময় স্নায়ুযুদ্ধ হঠাৎ করে উত্তপ্ত ভয়াবহ যুদ্ধে রূপ নেয় ও রণদামামা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে শোনা যেতে পারে যেমন হয়েছে ইরাক-ইরানের ক্ষেত্রে।

এ ধরনের সরাসরি যুদ্ধ ছাড়াও গুপ্তচরদের যুদ্ধ সব সময় চলতে থাকে। 'এসপায়োনজ যুদ্ধ' সংক্রান্ত কোনো খবরাখবর কদাচিৎ কখনো আমরা শুনে থাকি। এ ব্যাপারে প্রথম সারির প্রতিযোগীরা হচ্ছে পরাশক্তিসমূহ। আঞ্চলিক প্রভুত্ব লাভের তৃষ্ণায় তারা চিরদিনই অতৃপ্ত। আর বর্তমানে তাদের লক্ষ্যস্থল হলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। সাধারণত এ ধরনের অস্পষ্ট আশঙ্কা ও ভীতিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সার্বক্ষণিক একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একটি কার্যকরি পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া একটি কার্যকরি ও দক্ষ ইন্টেলিজেন্স সংস্থার জন্য সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক।

জনতা সরকারের সময় একবার বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স সংস্থাকে নিষিদ্ধ করার জোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। 'র'-এর বাৎসরিক বাজেট কমিয়ে ও নিয়মিতভাবে-এর লোক ছাঁটাই করে এ প্রক্রিয়াকে প্রায় সফলতার পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। সে উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে।

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর রটনা (!) তৈরি করার একটি ভৌতিক দক্ষতা আছে; বিশেষ করে এরা যখন এদের সম্পর্কে কোনো গুজব রটনাতে অত্যন্ত সংযমী (!) থাকার চেষ্টা করে। কেবিনেট সচিবালয়ের অধীন 'সর্বব্যাপী ব্যাপ্ত' বিদেশে দেশের 'চোখ ও কান' স্বরূপ 'র'-ও এ সংস্কারের বাইরে কিছু নয়। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে গোপনীয়তায় মিশিয়ে রাখার পরও, 'র'-জন প্রচারণার আজগুবী কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে এর বিষময় ফল প্রকাশ পায়। 'র' ইতোমধ্যে তিন বছরের কম সময়ের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করছিল। ১৯৮০ সালে মে মাসের শেষ দিকে সংস্থার দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সংস্থা হতে তাদের বিযুক্তির আদেশ পান। এরা হলেন অতিরিক্ত পরিচালক শিব রাজ বাহাদুর ও যুগ্ম পরিচালক এম, এস, ভাটনগর। এ বদলি আদেশে অনেকে হতবাক হয়ে পড়েন। সংস্থার অসন্তুষ্ট অংশ তখন থেকে উত্তপ্ত হতে শুরু করে ও জ্ঞাতসূত্র মতে পরিবর্তনের হাওয়া সংস্থা প্রধান এস, এন সানটুককে পদচ্যুত করার পর্যায়ে উপনীত হয়। সানটুকের উত্তরসূরি নির্ধারণে এমনকি বাজি ধরা হয়েছিল অথচ সানটুক দু'বছর পূর্বে এক গোলমেলে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে এ সংস্থার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সত্য হোক বা মিথ্যে হোক, কোনো ইন্টেলিজেন্স সংস্থার প্রধান পদে এরূপ 'যখন তখন', হরহামেশা পরিবর্তন কোনো শুভ লক্ষণ নয়। এভাবে সংস্থায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার জন্য এ সংস্থা পরিচালনাকারীদের কাউকে দায়ী করা সঙ্গত নয় বরং রাজনীতিবিদ হিসেবে যারা একে নিয়ন্ত্রণ করেন তারাই এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য দায়ী বলে বিবেচিত হতে পারেন।

'র' সূত্র মতে, নতুন উদ্ভাবিত 'ওলট-পালট' অবস্থা সরকারের নতুন চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর পুনঃআগমনের সাথে সাথে একটি শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স সংস্থার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় ভালোভাবে অনুভূত হয়। এভাবে পুনরায় পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরুর পর্যায়ে শোনা যায় বেগম গান্ধী তাঁর দপ্তরে পাঠানো পরস্পরবিরোধী তথ্য সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্য স্থির করার সিদ্ধান্ত নেন। যতোদূর জানা যায়, তাতে স্থির নিশ্চিত খবর পাওয়া যায় যে, শ্রীমতি গান্ধী একটি 'পর্যবেক্ষণ কমিটি' গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যা একই সাথে 'র'-এর সকল তথ্য-উপাত্ত ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ক গোয়েন্দা তথ্যাদির ওপর নজর রাখার কাজ চালিয়ে যাবে। এ সংক্রান্ত একটি খবর ১৯৮০ সালের ১৬ জুন সংখ্যা 'ইন্ডিয়া টুডে'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

দু'মাস পর 'দি ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ায়' টি, এন, কাউলও অনুরূপ একটি তথ্য উপস্থাপন করেন। কাউল উল্লেখ করেন যে, 'জাতীয় সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য

কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত'। এদিকে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি 'জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি' গঠনের আলোচনা চলতে থাকে, যেখানে ওই কমিটি জরুরি সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি সুদূরপ্রসারী সমাধান বাতলে দেবে, তথ্য ও ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসমন্বিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। এ কমিটি তার কাছে পাঠানো বিষয়াদির উপর সুপারিশমালা প্রণয়ন অথবা ন্যূনপক্ষে রূপরেখা তৈরির ব্যাপারে ধারণা দিতে পারে। এ ধরনের একটি অনিয়মিত কমিটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে 'বাংলাদেশ অপারেশনের' সময় তৎপর ছিল। এ ধরনের কমিটির প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর কাজ হবে প্রধানত উপদেশভিত্তিক ও সুপারিশমূলক কিন্তু 'নির্বাহী' প্রকৃতির নয়। এটা মন্ত্রণালয়গুলোর দৈনন্দিন কাজে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এর বাইরের প্রমাণিত যোগ্যতা ও দক্ষতা সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি 'অনুঘটক' বা 'বিশ্বস্ত বুদ্ধিদাতা'র কাজ করবে।

আমলাতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, কষ্টকর ও ধীরলয়ের; অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দৈনন্দিন ঝামেলা সামলাতেই ব্যস্ত থাকেন। পরিস্থিতি এমন একটি পদ্ধতি বা সংস্থার উপস্থিতি দাবি করে যা সমস্যা ও সুপারিশকৃত সমাধানের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করে জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ করবে। যদি এ প্রক্রিয়া অল্পদিনের মধ্যে আশাব্যঞ্জক ফললাভে সমর্থ হয় তবে স্তরভেদে একে পরিপূর্ণ অবয়ব প্রদানের যুক্তিসঙ্গত অবকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও দলগত চাপের ঊর্ধ্বে এমন কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন যারা প্রয়োজনীয় ও জরুরি সমস্যাগুলোর একটি সুন্দর ধীরস্থির ও যুক্তিপূর্ণ সমাধান দিতে পারবেন। ভারতে একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রয়োজন নেই, বরং এমন একটি নমনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংসদীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক যা দেশের বিশেষ প্রয়োজন ও পরিস্থিতির সঠিকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা এ ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ।

কংগ্রেস সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর 'র'-এর পুনঃসজ্জিতকরণ, বছরের পর বছর ধরে হতাশ একটি সংস্থার জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক বলে প্রতিফলিত হয়। জনতা সরকারের ক্ষমতাগ্রহণের পর হতে 'র'-একটি ক্ষয়িষ্ণু সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। কারণ জনতা সরকারের বিশ্বাস মতে শ্রীমতি গান্ধীর জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে 'র' দেশের জরুরি কাজ অপেক্ষা গান্ধীর ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের প্রতি বেশি নজর দেয়, যার জন্য দেশাই সরকারের সময় প্রতিহিংসাবশত এ সংস্থার শক্তিশালী 'ডানা' বা 'বাহু'কে 'কেটে' কিছুটা শাস্তি প্রয়োগ অবধারিত ছিল। 'র'-পরিচালকের সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয়ার সাথে সাথে তাঁর বেতন স্কেলও কমিয়ে আনা হয়। পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী দেশাইয়ের মতে 'র'-এর পরিচালক পদটিতে কোনো উচ্চ মর্যাদার পূর্ণ সচিবের আদৌ প্রয়োজন ছিল না, বিধায় আমলাতন্ত্রের ডজন ডজন আমলার পদমর্যাদার নীচে 'অতিরিক্ত সচিব' পদে 'র'-প্রধানের পদটি নামিয়ে আনার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। এ

সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে কে, শংকর নায়ার যাকে উক্ত পদটি গ্রহণের জন্য আদেশ দেয়া হয়, তিনি সে ব্যাপারে মোটেই কোনো উৎসাহ দেখাননি।

অত্যন্ত নির্দয়ভাবে 'র'-এর বাজেট কমিয়ে ফেলার পর পর অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MEA = Ministry of External Affairs), 'র'-এর কিছু কিছু কাজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং 'র'কে প্রধান কমগুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগের মাধ্যমে মূলত পদাবনতি করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই তখন মূখ্যত বড় বড় শিকারের জন্য বড়শি পাতা শুরু করে।

এ ধরনের পরিস্থিতির সূত্র ধরে ঘটনাপ্রবাহ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যেখানে অসন্তোষের 'ঢাক ঢাক গুড়গুড়' শব্দ শোনা না গেলেও তা তখন অনুভব করা যাচ্ছিল। ১৯৮০ সালের জুলাই সংখ্যা 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকা একটি 'র' সূত্রকে উদ্ধৃত করে উক্ত সংস্থার সুইপারদের ধর্মঘট সংক্রান্ত একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ করে। যদিও এ ঘটনা অফিসারদের সে ঘটনার মতো ততোটা বিপর্যয়কর ছিল না কিন্তু এরমধ্যে বেশকিছু অনাহুত ঘটনা ঘটতে শুরু করায় 'র'-এর 'কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির' ট্রাক কাউন্সিলের উচ্চ পর্যায়ের একটি অংশ সভা চলাকালীন তাদের নির্দিষ্ট কিছু ওপরওয়ালার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে সভা থেকে বেরিয়ে আসেন। এ ধরনের সুপ্ত অসন্তোষ যদিও যথেষ্ট আশ্চর্যজনক ব্যাপার কিন্তু তবুও প্রায় সকল পর্যায়ে এ ধরনের চাপা 'গুড়গুড়' শব্দের আলামত শোনা যেতে থাকে।

'র'-এর একটি সূত্র মতে 'র'-এর জন্য এর চেয়ে আর খারাপ কিছু হতে পারে না, এবং এ হতাশাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীচুমানের ক্ষয়িষ্ণু মনোবল অবশ্যই নিরাপত্তার ব্যাপারে একটি ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট এবং ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করবেন, আপনি কিভাবে এ ধরনের সমস্যায় জর্জরিত একটি সংস্থার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট উৎকর্ষতা দাবি করতে পারেন?"

বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে খুব একটা ভুল ব্যাখ্যা দেননি এবং এবং আফগানিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানে বাবরাক কারমালের ক্ষমতা গ্রহণের পরপর আমি যখন সেখানে যাই তখন একটি হতোদ্যম সংস্থার কর্মক্ষমতা হ্রাসের সুস্পষ্ট লক্ষণ আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়। সেখানে ঘটমান 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ' সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতিতে কিছুটা রূপান্তরিত আকার ধারণ করেছিল।

'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' শব্দটি ওয়াল্টার লিপম্যান' নামক একজন সাংবাদিক ১৯৪৭ সালে প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর লিখিত পত্রিকার কলামে ও পরবর্তীতে ওই নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়। এ শব্দটি এখন পর্যন্ত অবিকৃতরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু আফগানিস্তানের অনেকের কাছে, যেমন একজন মুজাহিদের ভাষ্যমতে "ঠাণ্ডা যুদ্ধ শব্দটি হচ্ছে রাজনীতিবিদদের সুবিধা আদায়ে ব্যবহৃত একটি অর্থহীন শব্দ মাত্র; ঠাণ্ডা হোক আর গরমই হোক ফলাফল তো একই হতে দেখা যায়।"

আফগান মুজাহিদের উপরোক্ত মন্তব্যের পরপর প্রেসিডেন্ট কার্টারের বিশেষ দূত ক্লিফোর্ড ক্লার্ক নয়াদিল্লীতে আয়োজিত এক সাংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেন, 'সোভিয়েতরা যদি পারস্য উপসাগরের দিকে ধাবিত হয় বা হওয়ার চেষ্টা করে তবে সহজ কথায় তার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ।'

ক্লিফোর্ড ক্লার্ক বা আফগান মুজাহিদের 'মনের কথা' স্পষ্টভাবে বলার একমাস পূর্বে ১৯৭৯ সালে ১৪ই অক্টোবর হাফিজুল্লাহ আমিনের জীবনের ওপর প্রথম আঘাত হানা হয়। এর ক'সপ্তাহ পূর্বে তিনি প্রেসিডেন্ট নূর মোহাম্মদ তারাকীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজে প্রেসিডেন্টের আসন দখল করেন। সে দিনই বিদ্রোহী গ্রুপগুলো ব্যবসায়ী রূপী একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসের একজন 'র' অপারেটিভের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয় ও তারা ভারতীয় সরকারের সাথে আলোচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এ ব্যাপারে শুধুমাত্র ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার দাবি জানায়। পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশ কালক্ষেপণ করার ফলশ্রুতিতে যখন এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন কাবুলের রাষ্ট্রদূত বদলি হয়ে ঐ জায়গায় নতুন একজন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সবকিছু আবার নতুন করে শুরু হয়।

ইতোমধ্যে 'র' সদর দফতরের পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হয়েছে। জনতা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ফলে 'র'-এর আওতাধীন অনেক কাজ, বিশেষ করে যেখানে কোনো দূতাবাস জড়িত তা পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। যে বিশেষজ্ঞ উক্ত মন্ত্রণালয়ের আফগানিস্তান সংক্রান্ত কার্যাদির দায়িত্বে ছিলেন তাঁর কাছে তথ্যের বিশ্লেষণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই ছিল না যতোনা তিনি 'নিজে' নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

কাবুলের বহিঃসীমানার বিদ্রোহীদের নেতা ডঃ ওয়াখমানের সাথে একজন 'কন্টাক্ট'-এর মাধ্যমে কাবুলের একটি 'সেফ হাউসে' আমার আফগান পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। তাঁর সাথে দেখা করার পরই কেবল কাবুল দূতাবাসের ব্যর্থতার কথা আমি জানতে পারি। কাবুলের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও বিদ্রোহীদের নেতার মধ্যে 'র'-অপারেটিভের মাধ্যমে উভয়ের পছন্দনীয় একটি সেফ হাউসে দেখা করার ব্যবস্থা করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এ ধরনের একটি স্পর্শকাতর মিটিংয়ে 'র' অপারেটিভের অংশগ্রহণ নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হবে বিধায় দূতাবাসের একজন সদস্যকে সাক্ষাৎ করে এলাকা নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয় (!)। আফগান গুপ্ত পুলিশের (KAM) অত্যন্ত সতর্ক নজরদারির মধ্যে দূতাবাসের নির্বাচিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা যিনি পূর্বে ভারতীয় পুলিশে কর্মরত ছিলেন তিনি পর্যবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করেন। তার দেয়া রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত বাড়ি (সেফ হাউস) আফগান গোয়েন্দা বাহিনীর নজরদারির আওতায় থাকায় ওই পরিকল্পনা বাতিল বলে ঘোষিত হয় এবং এরপর বিদ্রোহীদের নেতা আর কখনই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দেখা পাননি।

পরবর্তী মাসগুলোয় হাফিজুল্লাহ আমিনকে হত্যার জন্য দু'বার চেষ্টা চালানো হয়েছিল।

এর একটি ছিল ২৭ নভেম্বর '৭৯ তারিখে অন্যটি ১ ডিসেম্বর '৭৯ তারিখ, কয়েকবার প্রাণে রক্ষা পেলেও 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে' ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে আমিন তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ নিহত হন এবং বাবরাক কারমাল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হন।

অভ্যুত্থান ও এর ফলাফল সারা পৃথিবীতে একটি সম্পূর্ণ অজানা ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে মজিদের (আফগান বিদ্রোহীদের নেতা, যিনি সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন) সাক্ষাৎকারটি সময়মতো সংঘটিত হতো তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অন্তত আমীনের ক্ষমতাচ্যুতির আশঙ্কার কথা ও আফগানিস্তানে সোভিয়েত অনুপ্রবেশের আগাম সংবাদ জানতে পারত। ড. ওয়াখমান (যা তাঁর আসল নাম নয়) আমাকে বলেছিলেন, তিনি ভারতীয় দূতাবাসের 'সাক্ষাতের পরিকল্পনা' বাতিল করায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এ পদক্ষেপ ভারতীয় নীতি পরিবর্তনের কোনো ব্যাপার নয় বরং এটি ছিল পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যর্থতা। কারণ ড. ওয়াখমানের মতে 'সেফ হাউস' এলাকা কখনই আফগান গুপ্ত পুলিশ (KAM) পর্যবেক্ষণের আওতায় ছিল না এবং বিদ্রোহীরা তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ও পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন। ড. ওয়াখমানের ভাষায়, 'আপনি কল্পনা করতে পারেন যে, আবদুল মজিদ, যার মাথার মূল্য অনেক এবং যাকে পেলে কে, জি, বি ও আফগান পুলিশ সানন্দে গ্রেপ্তার করবে; সে পাহাড়ি এলাকা হতে কাবুলে এসেছিল পর্যাপ্ত কোনো নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই? কাজেই দেখা করার এলাকা অবশ্যই অত্যন্ত গোপনীয় বাড়িতে নির্ধারিত হবে ও তা বাবরাক কারমালের নিয়ন্ত্রণে নয় বরং আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এটা ভাবাই স্বাভাবিক। এ ছাড়াও বাড়ির চতুর্দিকের তিন মাইল এলাকায় আমরা কড়া নজর রেখেছিলাম। সুতরাং আমরা ভারতীয়দের বিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু বর্তমানে আমি জানি না এ ব্যাপারে আর কিইবা বলার আছে?

যদি দূতাবাসের নিরাপত্তা কর্মকর্তা পর্যবেক্ষণে না গিয়ে এ ক্ষেত্রে 'র'-অপারেটিভ পর্যবেক্ষণে যেতেন তবে তিনি, যারা নজর রাখছিল তাদের কয়েকজনকে চিনতে পারতেন। যদি কোনো প্রকারে বিদ্রোহী নেতার সতর্কবাণী যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছতো তবে তা হয়তো 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' গতি পরিবর্তন করে দিতে পারতো। তবে এ প্রশ্নটির উত্তর না দেয়াই শ্রেয় কারণ ইতিহাস নিজেই হয়তোবা নিকট ভবিষ্যতে এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিবে। তবে একটি ব্যাপার এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিষ্কার যে, একজন অপেশাদার ব্যক্তির বিশ্লেষণ ও তথ্য নিরূপণই এ ধরনের ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ। পৃথিবী আজ যে সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে চাচ্ছে, আশা করি এ ঘটনার মধ্যে তার অনেক উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

কারমালের ক্ষমতা গ্রহণের পরপর কে জি বি ও সি আই এ উভয়েই 'বিকৃত বা অসত্য তথ্য যুদ্ধ' (Disinformation war) শুরু করে এবং একে অন্যকে দোষারোপ করতে

থাকে। এদিকে পরিস্থিতি ঘোলাটে আকার ধারণ করায় আফগানিস্তানে কি ঘটছে তা কেউ সঠিকভাবে জানতে পারছিলেন না। কেবলমাত্র প্রথমবারের মতো পৃথিবী কিছু কিছু ঘটনা জানতে পারে যখন সাংবাদিকরা বাবরাক কারমাল আয়োজিত প্রথম সংবাদ সম্মেলনে যাবার অনুমতি লাভ করেন। তবে কেন এ সব ঘটনা ঘটছে তা এরপরও জানা যাচ্ছিল না। আফগান সরকার শুধুমাত্র জানিয়েছিলেন 'রাশিয়ানরা নিজ থেকে আফগানিস্তানে আসেনি, সাম্রাজ্যবাদীরা সীমান্তের ওপার হতে (পাকিস্তান হতে) সমস্যা সৃষ্টি করছিল, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি জোট গঠন প্রায় সম্পন্ন হয়েছে; আফগানিস্তানে কোনো বিদ্রোহী তৎপরতা নেই ও আফগানিস্তানে অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন আছে এবং পশ্চিমা সংবাদ সংস্থার ব্যাপারে যতোদূর বলা যায় যে, তারা মিথ্যাবাদী' এবং বাবরাক কারমালের ভাষায় বিশেষ করে বি বি সি হচ্ছে 'পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মিথ্যাচারকারী সংস্থা'। ইতোমধ্যে ভারতীয় দূতাবাস তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণের আলোকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং একটি অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ভারতীয় দূতাবাস আফগানিস্তানের মাটিতে আফগান পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশী সাংবাদিকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে ও সে সমস্ত সাংবাদিকদের বলা হয়, "আফগানিস্তানে কোনো বিদ্রোহী তৎপরতা নেই, যা ছিটেফোঁটা আছে তা হচ্ছে পাকিস্তান ও ইরান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায়।"

কিন্তু কাবুলে আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বরের পর কাবুল যখন কে জি বি ও কে এ এমের অপারেটিভে ভর্তি ছিল তখন কাবুল হোটেলের একেবারে পাশেই (ওই হোটেলে তখন রাশিয়ান উপদেষ্টারা অবস্থান করছিলেন) হঠাৎ করে একজন মুজাহিদের সাথে আমার দেখা হয়ে যায় যা আমাকে একদম হতভম্ব করে ফেলে। এভাবে শত্রুর ঠিক নাকের নিচেই তারা তৎপর ছিল। কাবুলের ঠিক হৃৎপিণ্ডে কে জি বি সদর দপ্তরের খুব বেশি দূরে নয় এমন একটি জায়গায় আমি ডা. ওয়াখমান ও লায়লার (দোভাষী) সাথে দেখা করেছিলাম।

ডা. ওয়াখমানের দেয় সূত্রমতে আমি পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রদত্ত পর্যটক ম্যাপে বিপ্লবীদের কিছু অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হই। বিপ্লবীরা মোহাম্মদ জামানের নেতৃত্বে 'মিমানা'র এলাকাসমূহ, সাইদ আহমেদ ও সাফি মাহমুদের নেতৃত্বাধীনে যথাক্রমে 'নূরস্তান' ও 'বামিয়া'র এলাকাসমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ডা. ওয়াখমান মূলত কাবুলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে বাদবাকিরা পাহাড়ি এলাকায় তাদের তৎপরতা জোরদার করায় ব্যস্ত ছিল। তাঁকে চীনা ও মার্কিনিদের সীমান্ত এলাকায় তৎপরতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল বলে মনে হয়েছে। চীনা ও মার্কিনিরা সীমান্তব্যাপী কিছু মুজাহিদ সংগঠনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিল; এ সমস্ত মুজাহিদদের ডা. ওয়াখমান সুযোগ সন্ধানী বৈ কিছুই মনে করতেন না এবং তাঁর ভাষায়, "এরা শুধু খেলাফতের রাজত্ব কায়েমেই তৎপর, অথচ অন্যদিকে সাধারণ জনগণের রক্ত ঝরার পরিমাণ দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে।" তিনি এ ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ জিয়া নেজারী ও জিয়া নেসারী

নামক দু'জন স্বঘোষিত মুজাহিদ নেতার নাম উল্লেখ করেন যারা উভয়েই মার্কিন পাসপোর্টধারী এবং পেশোয়ার হতে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন যেখানে সি আই এ'র একটি অপারেশনাল ঘাঁটি রয়েছে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর এ মূল্যায়ন তাদের নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স সংস্থার সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে আফগান ও গুপ্ত পুলিশ-এর (KAM) প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন আরো অনেকেই এ ধরনের মন্তব্য করেন। অবশ্য আমি কাবুলে থাকাকালীন অবস্থায়ই আফগান গুপ্ত পুলিশ (KAM) সংগঠনকে অবলুপ্ত করা হয়।

হাফিজুল্লাহ আমিন একজন অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী 'কৌশলবিদ' হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর নিজ অবস্থানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে KAM-কে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পুনর্গঠন করে ইনফর্মারদের একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। তার ক্ষমতার মূল উৎস ছিল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, যাদেরকে তিনি ১৯৭৮ সালের এপ্রিলের পরপর নিজে নিয়োগ দান করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি মস্কোতে পাঠানো এক ব্যক্তিগত বার্তায় রাশিয়ান সাহায্যের ব্যাপারে সম্মতি প্রদানের আভাস দেন। অবশ্য রাশিয়ান উপদেষ্টারা এপ্রিলের 'সাউর' বিপ্লবের দু'বছর পূর্ব হতেই আফগানিস্তানে অবস্থান করছিলেন। চিঠি পাঠানোর ব্যাপারটি আমিনের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীই শুধু জানতেন এবং সে ভদ্র মহিলা আমিন নিহত হবার পর পর লন্ডনে চলে যান। রাশিয়ান সৈন্য প্রবেশের তারিখ ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারি নির্ধারিত থাকলেও সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে অনেক আগেই কঠিন আঘাত হানা হয়। কারণ রাশিয়ানদের ধারণা ছিল যে, আমিন মার্কিনিদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত 'ডাবস'-এর (যাকে পরবর্তীতে কিডন্যাপ করে হত্যা করা হয়েছিল) সাথে আমিনের যোগাযোগ রাশিয়ানদের প্রচণ্ড রকম ক্ষেপিয়ে তোলে; তাই তারা প্রতিপক্ষের যে কোনো রকম সুযোগ গ্রহণের পূর্বেই নিজেরা সুযোগ গ্রহণ করেছিল। ঘটমান আফগান পরিস্থিতির জটিলতা নিয়ে একজন আমেরিকান জেনারেলের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৭৮ সালের জুনে এ্যানাপোলিসে ২৭০ জন জেনারেল ও কূটনীতিবিদের সম্মেলনে তিনি মন্তব্য করেন, "রাশিয়ানরা যদি কোনোভাবে পাকিস্তান দখল করতে পারে তবে তারা আরব সাগর পর্যন্ত একটি বাধা বিঘ্নহীন পথ পেয়ে যাবে এবং হরমুজ প্রণালী বরাবর গিয়ে পারস্য উপসাগরের প্রবেশ পথে ঘাঁটি তৈরির মাধ্যমে পুরো এলাকায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবে।"

পরিস্থিতি সম্পর্কে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ধারণা যাই হোক না কেন, দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই মূলত: চীনা উস্কানিতে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিল (এটি লেখকের নিজস্ব মতামত)। এদিকে যখন সোভিয়েত সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে ঠিক তখনই আমি 'আনাহিতা রাতেজবাদ' নামক একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আফগান মন্ত্রিসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্যের সাক্ষাত লাভ করি। ভদ্র মহিলা আমাকে একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর চীনা-মার্কিন পরিকল্পনার প্রতি

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে উক্ত উভয় দেশই 'ওয়াখান', 'বদখশান' ও 'উত্তর-পশ্চিম পাখতিয়ার' প্রদেশ নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে প্রবাসে একটি 'পুতুল সরকার' গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাদের ধাপে ধাপে স্বীকৃতি দিয়ে শেষ পর্যায়ে আফগানিস্তানের বিধিসম্মত সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

এ সব পর্যালোচনা একটি ধ্রুব সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে, ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃপক্ষ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটার আগের ও পরের কোনো ঘটনা সম্পর্কেই ভালোভাবে কিছু জানতো না। যেদিন অন্য সকল সাংবাদিকের সাথে আমিও আফগানিস্তান হতে বহিষ্কৃত হই, সেদিনই আমি কাবুলে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জনাব তেজার সাথে একত্রে দুপুরের খাওয়া খাবার সুযোগ পেয়ে যাই। এরপর যখন বিমানে দিল্লী ফিরছিলাম তখন ওই একই বিমানে দিল্লীতে নবনিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ হাসান শারাকও ভ্রমণ করছিলেন। সুযোগ পেয়ে আমি তাঁর সাথে দেখা করার আশা করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী ক'মাস না যাওয়া পর্যন্ত আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। অবশেষে বেশ কয়েকমাস পর একটি পত্রিকার জন্য আমি তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ লাভ করি।

এদিকে ড. তেজা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ভালো বলে তাঁর মত ব্যক্ত করেন, যদিও তিনি এমন এক সময়ে সেখানে নিযুক্ত হন যখন একটি অভ্যুত্থান আরেকটি নতুন অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। অবশ্য তাঁকে যাঁরা আফগান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরাম কেদারায় বসে সুদূর দিল্লী হতে অবস্থার বিশ্লেষণ করেছিলেন। যাদের মাঠপর্যায়ে কর্মরত থাকার কথা, তারা কেউই 'র'-এর অপারেটিভ ছিলেন না এবং সে জায়গায় নিয়োজিত কূটনীতিবিদগণ তাঁদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে 'সকল সাংবাদিকদের সম্মিলন স্থল' কাবুলের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে দিন কাটাতে পছন্দ করতেন। নিজেদের মধ্যে আড্ডা মেরে আর কূটনৈতিক বৃত্তে আলাপ-আলোচনা করে তাঁরা আফগানিস্তান সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতেন। তবে অন্যান্য জায়গায় খোঁজ না নেয়ার জন্য কেউই তাদের কোনো দোষ দিতে পারেন না, কারণ তাঁরা ওই ধরনের বিশেষ কাজে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং কূটনীতিবিদ হিসেবে তা তাদের প্রয়োজনীয়ও নয়। আমি কাবুলে বেশ কিছুদিন থেকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি যে, এসপায়োনেজ সংক্রান্ত কাজ কারবার পেশাদার অপারেটিভদের হাতে ছেড়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমার আফগানিস্তান সম্পর্কে এতকিছু বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার বর্ণিত ঘটনাবলী "প্রশিক্ষিত কারও পক্ষে তথ্য সংগ্রহের ব্যর্থতা প্রমাণ করার জন্য একটি উদাহারণ হিসেবে প্রতিবিম্বিত হতে পারে।"

যদিও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ আমার মতামত বা তাদের গৃহীত পদক্ষেপের আলোকে 'কথিত ব্যর্থতার' উপযুক্ত জবাব দিবেন ও তৎসঙ্গে বলতে পারেন যে, ভারত পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাবলী যদি সময়মতো জানতেও পারত, তবুও মার্কিনী, সোভিয়েত বা চীনা কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত বা প্রভাবিত করার কোনো

ক্ষমতা তার ছিল না আর তাই তথ্য সংগ্রহের সফলতা ব্যর্থতায় এমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু কে জানে বা কেউ কি একেবারে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেন যে, "ভারত সময়মতো সঠিক তথ্য পেলে কিছু একটা করতে পারত না?" আমার মূল প্রশ্নে পুনরায় ফিরে এসে প্রশ্ন করা যায় "কেন 'র' আফগানিস্তানে আসল পরিস্থিতি সংক্রান্ত খবরাখবর প্রদানে ব্যর্থ হয়েছিল?" এর উত্তরে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায় " 'র' কে আফগানিস্তানে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।"

ক। এবার কী হবে? (What Next?)

কখনো কখনো যখন বাস্তবতা রূপকথায় বিলীন হয়ে যায় তখন আমাদের একটি অত্যন্ত কঠিন, রূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। "গুপ্তচরবৃত্তি কি আদৌ প্রয়োজনীয়?" এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পেতে আমাদের খুব দূরের ইতিহাসে অবগাহন করার কোনো প্রয়োজন নেই বরং বিশ শতকের নিকট অতীতের দিকে দৃষ্টি দেয়াই যথেষ্ট।

এ ধরনের একটি পৃথিবীব্যাপী সাড়াজাগানো ঘটনা হচ্ছে 'ফ্রান্সিস গ্রে পাওয়ার্সকে' নিয়ে বিখ্যাত 'ইউ-২ (U-2) অপারেশন'। পাওয়ার ছিলেন বিমান বাহিনীর একজন পাইলট। তাঁকে পেশোয়ারের সি আই এ নিয়ন্ত্রিত 'বিমান ঘাঁটি'তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিশেষ যন্ত্রপাতি সজ্জিত লকহীড কোম্পানির একটি 'ইউ-২' 'গুপ্ত-পর্যবেক্ষণকারী' বিমান ৬৮,০০০ ফুট উচ্চতায় চালিয়ে রাশিয়ান ভূখণ্ড অতিক্রম শেষে উত্তর নরওয়ের 'বোদো'-তে অবতরণে নির্দেশ দেয়া হয়। এটি ছিল ১৯৬০ সালের ১ মে'র ঘটনা। (পাকিস্তানের পেশোয়ারের একটি গোপনীয় স্থান হতে এ ধরনের আরো অনেক অপারেশন চালানোর পর এক পর্যায়ে রাশিয়ান সরকার মিসাইল আক্রমণের হুমকি দিলে সি আই কে বাধ্য হয়ে উক্ত এলাকা পরিত্যাগ করতে হয়। অবশ্য পাকিস্তান সরকারও মার্কিনীদের চলে যাবার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল -অনুবাদক)।

পাওয়ারের বিমান অত্যাধুনিক পর্যবেক্ষণ সরঞ্জামাদিতে সজ্জিত ছিল এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল ১৩ মাইল উচ্চতায় ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে উড়ন্ত অবস্থায় রাশিয়ার নির্দিষ্ট এলাকাসমূহের ছবি তোলা। বিমানের ক্যামেরা দিয়ে প্রতিটি ছবিতে ১৩০ বর্গমাইল এলাকার ছবি তোলা সম্ভব ছিল। যখন তিনি প্রায় অর্ধেক পথ পার হয়ে 'শোভাদুর্লভস্কের'র আকাশে ৬৮,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন তখন সোভিয়েত বিমান বাহিনীর প্লেনগুলো তাঁর বিমানকে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হয়। তবে পাওয়ার 'বেইল আউট' করে প্রাণে রক্ষা পান। স্থানীয় পুলিশরা তাঁকে গ্রেফতার করে ও পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কে জি বি'র কাছে হস্তান্তর করে। সোভিয়েত সরকার এ ঘটনা 'শীর্ষ সম্মেলন' (Summit Conference) অনুষ্ঠানের ঠিক পূর্বমুহূর্তে জনসমক্ষে প্রকাশ করে, যার ফলশ্রুতিতে সারা দুনিয়া, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, তৃতীয় বিশ্বের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ক্রুশ্চেভের এ ধূর্ত পদক্ষেপের দরুন একই সাথে 'শীর্ষ সম্মেলন' ও 'ইউ-২' প্রকল্প অকার্যকর হয়ে পড়ে। এর পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বমোট ৫০টি 'ইউ-২'

বিমান তৈরি করেছিল ও সোভিয়েত রাশিয়ার আকাশ সীমায় আনুমানিক 'বার' বার গোপন বিমান অপারেশন পরিচালনা করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়াও তারা কিউবা, চীন ও উত্তর কোরিয়াতেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়াও এ ব্যাপারে খুব একটা পিছিয়ে ছিল না। 'নিউম্যান' তাঁর 'The world of Espionage' বইয়ে এরূপ একজন রাশিয়ান পাইলটের কথা উল্লেখ করেছেন (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক), যিনি 'স্ক্যানডিনেভিয়ান' দেশসমূহে বিমান চালিয়ে এসপায়োনেজ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীতে পশ্চিমা কোনো একটি দেশে পালিয়ে যাবার পর তাঁর এ কাহিনী প্রকাশিত হয়। অন্যান্য অনেকের মতে, সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ 'মানচিত্র' ও 'আকাশ চিত্র' সংগ্রহকারী দেশ হিসেবে পরিচিত।

যখন এ ধরনের কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়, তখন সাধারণ জনগণ এ সব বন্ধ করার জন্য তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এদিকে পৃথিবীতে অভাবনীয় প্রযুক্তিগত উন্নতি হওয়ায় 'গুপ্তচর বিমানের' দিন শেষ হয়ে গেছে ও নতুন উদ্ভাবিত উন্নতমানের একটি টেলিস্কোপ বা উপগ্রহের মাধ্যমে অনেক সহজে ও নিরাপদে যে কোনো স্থানের ছবি তোলা বর্তমানে অনেক সহজ কাজ। বিজ্ঞানের এতো উন্নতি হওয়ার পরও মাঠপর্যায়ের একজন গুপ্তচরের বিকল্প খুঁজে পাওয়া কষ্টকর; কারণ তাঁকে প্রতিস্থাপন করার অন্যকোন কার্যকর উপায় এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

যদিও আজ পর্যন্ত ভারতে কোনো 'হ্যারল্ড কিম ফিলবী' (পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে অনুপ্রবেশকারী সবচেয়ে সার্থক কে জি বি এজেন্ট যিনি বিশ বছর ধরে মস্কোর পক্ষে নির্বিঘ্নে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যান) ধরা পড়েনি কিন্তু বেশকিছু 'ছোট মাপের' ও অল্পকিছু 'বড় মাপের' গুপ্তচর ধরা পড়েছে। কিন্তু এদের সম্পর্কে বিশেষ কোনো কিছু জানা সম্ভব নয়।

গত সাত বছর যাবত (১৯৮১ সাল পর্যন্ত) ভারতে সর্বমোট ২৩ জন বিদেশী গুপ্তচর ধরা পড়ে। (যার মধ্যে পাকিস্তানী ১৪ জন, কে জি বি'র ৭ জন ও সি আই এ'র ২ জন) এ ছাড়াও অন্য আরো কিছু দেশের বেশ কিছু গুপ্তচর ভারতে তৎপর, যাদের বেশিরভাগই হচ্ছে ভারতীয় নাগরিক যাদের এসপায়োনেজের ঐতিহ্যগত ধারায় গুপ্তচরবৃত্তিতে টেনে আনা হয়েছে। ধৃত গুপ্তপচরের সংখ্যা কম হওয়ায় গুপ্তচরবৃত্তির মাত্রা হ্রাসের কথা অনেকে বলতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে ধরনের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি আর তাই 'কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স'-এর মাত্রাতেও কোনো হেরফের হয়নি। পাকিস্তানী, রাশিয়ান ও মার্কিনীদের ধৃত গুপ্তচরদের সংখ্যানুপাতে মনে হতে পারে যে, একদেশ অন্যদেশ হতে বেশি বা কম ক্রিয়াশীল। কিন্তু গত তিন বছরের পর্যালোচনায় যা প্রতিফলিত হয় তাতে ভারতে গুপ্তচরবৃত্তির মাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে বলে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে চীন বা রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশ অপেক্ষা গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা অনেক সহজ ব্যাপার। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে মূলত সামরিক শক্তির ওপর গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা হচ্ছে। যে সমস্ত এজেন্সি এখানে বেশ ভালোভাবে সক্রিয়

তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাশিয়ান গুপ্তচর সংস্থা ও এরপর পর আমেরিকান, পাকিস্তানী, জার্মান, জাপানী, বৃটিশ, ফরাসী, পোলিশ, চেকোস্লাভ এবং ইসরাইলী গুপ্তচর সংস্থার নাম উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এগুলো ছাড়াও অন্যান্য দেশের এজেন্সি ও কমবেশি তৎপর এবং বর্তমানে ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞদের ধারণানুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু দেশের সংস্থাও ভারতে খুঁটি বেড়ে বসেছে। তবে ইরান, মিসর ও চীনা সংস্থাগুলো সবচেয়ে কম ক্রিয়াশীল বলে জানা যায়।

রাশিয়ানদের, অন্য দেশ অপেক্ষা তথ্যের উৎসে অনুপ্রবেশের সুযোগ কিছুটা বেশি। কারণ তাঁরা উপদেষ্টা হিসেবে ভারতের বিভিন্ন স্থাপনায় নিয়োজিত থাকার সুবাদে ওই সমস্ত সংস্থা বা স্থাপনার সম্ভাবনাময় কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের এজেন্ট হিসেবে সহজেই নিয়োগ করতে পারেন; আবার অন্যদিকে নিজেরাও প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার সুযোগ পান। বিগত কয়েক বছর যাবত যেহেতু ভারতীয় সমরোপকরণের চাহিদা রাশিয়ানদের মাধ্যমেই পূরণ হয়ে আসছে, তাই তাদের ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত সহজ একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়াও এটা লক্ষ্য করা গেছে সোভিয়েতরা পরোক্ষ উপায়ে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনার জন্য আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশি অর্থ খরচ করে থাকে।

সি আই এ এবং কে জি বি উভয়েরই দু'ধরনের রেসিডেন্ট আছে (এদের অবশ্যই পূর্বে উল্লেখিত রেসিডেন্ট এজেন্টের সাথে তুলনা করা যাবে না। এদের কভার ও কার্যক্রম ভিন্ন প্রকৃতির)। প্রথমত সম্ভ্রান্ত সরকারি ক্যাডার কূটনীতিবিদগণ এবং দ্বিতীয়ত ছাত্র, ডাক্তার, শিল্পী ও সর্বশেষ আধুনিকতম সংযোজন হিসেবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন একজন উপদেষ্টা বা কনসালট্যান্ট। ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞদের ধারণা মতে, কে জি বি ভারতে সর্বোচ্চ সংখ্যক (প্রায় ৫০ জন) অপারেশনাল এজেন্ট নিয়োগ করেছে। এরপর পর সি আই এ'র ২০ জন হতে ২৫ জন এজেন্ট আমাদের দেশে সক্রিয়। অন্যদিকে চীনারা মূলত কূটনৈতিক পরিমণ্ডলের আওতায় প্রচার প্রপাগান্ডা পরিচালনায় ব্যস্ত। এদের ঠিক পরবর্তী আসনটি দখল করে আছে পাকিস্তান যারা ভারতের প্রায় সকল পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করেছে। এ ছাড়া অন্যান্য দেশের একজন বা দু'জন করে এজেন্ট কূটনৈতিক আড়ালে কর্মরত আছে। তবে জার্মানরা কূটনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে তাদের গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করে থাকে যা প্রচলিত প্রথার অনুকূল নয়।

সাধারণত: সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত কূটনৈতিক যোগাযোগ মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, কিন্তু পাকিস্তানীরা এ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে আলাদা বেতার যন্ত্র ব্যবহার করেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ধরাও পড়েছে।

কে জি বি সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যম মানের কর্মচারীদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায়। এদের মাধ্যম হিসেবে সরকারি অফিসের কেরাণী, আকাশবাণীর বেতার অপারেটর ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট সংস্থার লোকজনের কথা উল্লেখ করা যায়। এ পদ্ধতিটি ভারতে কে জি বি'র মৌলিক কর্মপ্রক্রিয়া হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। অন্যদিকে

মার্কিনীরা ও অন্যান্যরা মূখ্যত উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ী বা কর্মকর্তাদের ব্যবহার করতে পছন্দ করে। 'থমাস পাওয়ার্স' তাঁর 'The Man Who Kept Secrets' গ্রন্থে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিপরিষদে সি আই এ'র এজেন্টের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, যখন ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছিলো, তখন ভারত পশ্চিম পাকিস্তানেও একই সাথে আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ আক্রমণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ৭ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার সি আই এ কে নির্দেশ দেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর সি আই এ এব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে, কিন্তু মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ভারতে নিযুক্ত কেস অফিসার, যিনি মিসেস গান্ধীর মন্ত্রিসভার রাজনীতিকদের ওপর নজরদারি করতেন, তিনি দিল্লি হতে খবর পাঠান, "ভারত এই মাত্র পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" এ বার্তাটি তৎক্ষণাৎ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে পাঠানো হয়। নিক্সন পরবর্তীতে প্রায়ই এই বার্তাটির উল্লেখ করে মন্তব্য করতেন "সি আই এ কেবল এ সংবাদটিই তাঁকে সময়মতো জানাতে পেরেছে।" কিন্তু এ বার্তাটি হোয়াইট হাউসে যত্রতত্র এতো আলোচিত হয় যে, এটি পুরো বিবরণসহ জ্যাক অ্যান্ডারসন নামের এক সাংবাদিকের হস্তগত হয় এবং তিনি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তা পত্রিকায় প্রকাশ করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে সি আই এ ও সংশ্লিষ্ট এজেন্টরা হতচকিত হয়ে পড়ে এবং দিল্লীর এজেন্টের গুপ্তচর জীবনের ইতি ঘটে। এ ব্যাপারে নিক্সনের মন্তব্য ছিল, "তোমরা সব জাহান্নামে যাও।" ('র'-সূত্রের দাবি অনুযায়ী এ সবই ছিল সি আই এ'র বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ফায়দা লোটার প্রচেষ্টা এবং এন্ডারসনের কাছে পরিকল্পিত উপায়ে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছিল। সে সময় ভারতীয় মন্ত্রিসভায় কোনো এজেন্ট থাকার প্রশ্নই আসে না এবং ১৯৭১ সালের ভারতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে সি আই এ কিছুই জানতো না।)

সোভিয়েতরা পরবর্তীতে মার্কিনিদের মতো ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে, বিশেষ করে তারা রফতানিকারকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালায়। বিশেষ করে রফতানিকারকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী সি আই তাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করে, কিন্তু ভুল পদক্ষেপের দরুন সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সোভিয়েতদের অনুসরণে তারা ডকইয়ার্ড এলাকায় এমন লোকদের এজেন্ট নিয়োগ করে যারা মালামাল খালাসের কাগজপত্র তদারকিতে নিয়োজিত। ওই সময় জাহাজ থেকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ক্রয় করা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নামানো হচ্ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সি আই এ বেশ কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখে, কিন্তু একপর্যায়ে তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। সব কিছু ফাঁস হয়ে পড়ে এবং তাদের নিয়োজিত 'কেস অফিসার' একজন ডক শ্রমিকের নিকট হতে মালামাল খালাসের তালিকা সংগ্রহের সময় হাতে নাতে ধরা পড়েন। এ ঘটনায় সি আই এ কে যথেষ্ট হেনস্তা হতে হয়েছিল।

ভারতে গুপ্তচরবৃত্তি চালানোর পাশাপাশি সি আই এ ও কে জি বি একে অপরের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি চালানোর জন্য তাদের প্রায় অর্ধেক সময় ব্যয করে। উভয়েই অপর পক্ষের

ড্রাইভার ও সুইপারদের ঘুষ দিয়ে তথ্য আদায়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। পাশাপাশি কূটনৈতিক পরিমন্ডলে নিজেদের 'যা করার' তা তো করছেই।

সোভিয়েত গুপ্তচরদের শনাক্ত করা অন্যদের চেয়ে সহজ, কারণ তারা তাদের নিজস্ব পরিমন্ডলের মধ্যে অবস্থান করতে চায়। এ ছাড়াও যারা কূটনৈতিক এলাকা বা এর বাইরে অবস্থান করে তারা নগরীর কোন অভিজাত এলাকায় বসবাস করলেও দূতাবাস ও অন্যান্য পর্যায়ে চিহ্নিত হয়ে যান। অভিজাত পোশাক-আশাক পরে উচ্চপর্যায়ে ঘোরাফেরা করার পরও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের শনাক্ত করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে মার্কিনি ও অন্যদের চালচলন সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় তাদের শনাক্ত করা বেশ কঠিন। তারা সব সময় একই পদ্ধতি অনুসরণ না করে সময় ও পরিস্থিতির আলোকে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তবে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য কিছু কৌশল অবলম্বন করে এদের চিহ্নিত করা যায়। একবার একজন ইন্টেলিজেন্স পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছিলেন, "একজন সি আই এ এজেন্টকে অনেকের মধ্য থেকে বেছে বের করতে হলে আপনাকে দূতাবাসে গিয়ে দূতাবাস ডিরেক্টরিতে এমন পদমর্যাদার কাউকে খুঁজে পেতে হবে যার পদটি সঠিক ও প্রচলিত বলে মনে হয় না; এবং এ ধরনের কাউকে চিহ্নিত করা গেলে, আপনি আশা করতে পারেন যে কোনো একজন সি আই এ এজেন্টকে আপনি চিহ্নিত করে ফেলেছেন।" যদিও এ পদ্ধতিটি 'অত্যন্ত সহজ' বলে মনে হয়, কিন্তু এভাবে অনেককে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

কোনো দেশ কখনো গুপ্তচর নিয়োগের কথা স্বীকার করে না। প্রাচীনকাল হতে এটাই প্রচলিত 'আপ্তবাক্য' হিসেবে স্বীকৃত। কোনো একজন লেখকের ভাষ্যমতে (আমি এ মুহূর্তে তাঁর নাম মনে করতে পারছি না বলে দুঃখিত), "ধরুন, 'ক' নামক কোনো একটি দেশ 'খ' নামক দেশের একজন গুপ্তচরকে গ্রেফতার করলো, তখন অতি অবশ্যই তাঁকে তাঁর নিজ দেশ অস্বীকার করে বসবে। এর কদিন পর যদি 'খ' দেশে 'ক' দেশের কোনো গুপ্তচর ধরা পড়ে তবে আবার সেই পুরানো নাটকের অবতারণা হবে। তবে শেষমেশ দেখা যাবে যে, কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর উভয় দেশই একে অন্যের সাথে গ্রেফতারকৃত গুপ্তচরদ্বয়ের বিনিময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" সুতরাং ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম কখনো বন্ধ হয় না বরং ক্রমাগত এর উৎকর্ষ সাধন করা হয়। কখনো কখনো ইন্টেলিজেন্স পরিমন্ডলে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারযুদ্ধ শুরু করে দেন। এরূপ একটি ঘটনা হচ্ছে সি আই এ'র প্রকাশিত ও অর্থ সাহায্যে প্রচারিত 'জন ব্যারন' লিখিত 'KGB-The Secret Work of Soviet Secret Agents' নামক বইটি যা ভারতসহ সারা পৃথিবীতে সর্বত্র সহজলভ্য। অন্যদিকে এ বই প্রকাশের কিছুদিন পর কে জি বি সারা পৃথিবীর সেরা সি আই এ এজেন্টদের তালিকাসহ একটি বই প্রকাশ করে।

পৃথিবীতে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় গুপ্তচর জগতেও 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' একটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার, আর তাই গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তাও আরো অনেক বেশি বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আসুন আমরা সমস্যাটিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করি। পৃথিবীতে ভবিষ্যতে কী কী অবস্থান ও দিক থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাব ও বিস্তার লাভের পর যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিকোণ হতে যুদ্ধ নিম্নলিখিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ যুদ্ধ লাগতে পারে–

১। সমান পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন এমন দুটি দেশের মধ্যে,

২। একটি পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ ও অন্য একটি পারমাণবিক ক্ষমতাহীন দেশের মধ্যে, অথবা এমন দুটো পক্ষের মধ্যে,

৩। যারা প্রচলিত উন্নত অস্ত্রের অধিকারী।

এখন, যুদ্ধ যদি প্রথমে উল্লিখিত দুটি দেশের বা জোটের মধ্যে সংঘটিত হয় তবে তা উভয়ের জন্য হবে আত্মহত্যামূলক পদক্ষেপ। এটি প্রতিরোধের সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে উভয় পক্ষের মধ্যে অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তিতে উপনীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো চুক্তি ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লিখিত যুদ্ধাবস্থায় পারমাণবিক ক্ষমতাহীন কোনো দেশ যদি পারমাণবিক ক্ষমতাধর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় তবে তার গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষে অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া বেশ ভালোভাবেই অনুসরণ করা হবে।

'লিড্‌ল হার্ট', (ক্যাপ্টেন লিড্‌ল হার্ট- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর অফিসার ছিলেন) যিনি একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে সমধিক পরিচিত, তিনি যুদ্ধ সম্পর্কিত চমৎকার কিন্তু অতি বাস্তব একটি মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে, "যদি একপক্ষ আণবিক শক্তির অধিকারী হয়, তবে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা নিছক নির্বুদ্ধিতা। তাই এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই এবং প্রতিরোধের উপায় হওয়া উচিত অন্তদর্শী বা ধূর্ত কূটনীতির আশ্রয় নেয়া বা অহিংস উপায়ে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। যেখানে উভয়পক্ষই পারমানবিক ক্ষমতাসম্পন্ন সেখানেও যুদ্ধ করা একেবারেই বোকামী বৈ কিছু নয়, কারণ পারমাণবিক ক্ষমতা নিয়ে সীমাহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বোকামি হতেও চরম বাজে সিদ্ধান্ত এবং সবশেষে তা উভয়ের জন্য আত্মঘাতী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এ সব কিছুর আলোকে দৃঢ়ভাবে বলা যাবে না যে যুদ্ধ সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যাবার আদৌ কোনো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যুদ্ধোম্মাদ নেতারা যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হওয়া ব্যতিরেকে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রসার কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসতে পারে এবং এটা দু'পক্ষের অনুমোদিত নিয়ম রীতির আওতায় চলে আসবে বলে ধারণা করা যায়। এ ধরনের বন্ধনের ফলশ্রুতিতে নতুন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটা স্বাভাবিক... অনুপ্রবেশ হয়ে উঠবে মৌলিক পদ্ধতি... যতো বেশিমাত্রায় ও গভীরতায় অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়া সচেষ্ট হবে ততই প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে আনবিক শক্তির মোতায়েন বা ব্যবহার সীমিত হয়ে আসবে।" (Liddell Hart, 'The Revolution of Warfare', Faber, London, 1946, Yale, U.P. New Haven. 1947. Also See Brian Bond Liddell Hart-"A Study of his Military

Thought", Cassell and Company Ltd. London, 1971).

যুদ্ধ প্রতিরোধ সম্পর্কেও 'লিড্‌ল হার্ট' একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেন, "যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের কিছু শিখিয়ে থাকে, তবে এতোদিনে আমাদের যুদ্ধ প্রতিরোধের একদম নিশ্ছিদ্র কোনো ব্যবস্থায় মনযোগ কেন্দ্রীভূত করার বিপদ সম্পর্কে সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সাথে সাথে বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার ওপর নজর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে যুদ্ধ প্রতিরোধ করা না গেলেও যেন পর্যায়ক্রমিক শান্তি প্রক্রিয়ায় কোন বাঁধা না পড়ে।"

আমি কখনই একজন ভবিষ্যতদ্রষ্টা বা সমরবিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু 'লিড্‌ল হার্টের' পর্যবেক্ষণ আমার কাছে স্বাভাবিক ও সাধারণ মাত্রাজ্ঞান প্রতিফলিত করেছে বলে মনে হয়। তাঁর পর্যবেক্ষণ এ ধারণাকে আরো দৃঢ় করে যে, যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য অতি অবশ্যই একটি শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি থাকা প্রয়োজন। 'থমাস পাওার্সের' ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "আধুনিক যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য সশস্ত্র বাহিনী, টেলিফোন, ডাক ও রাজস্ব বিভাগের মতো, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

তবে 'র'-এর ক্ষেত্রে হয়তো প্রশ্ন করা যায়, 'র'-কে কি কাজে লাগানো হবে?" এর উত্তর নিহিত আছে ভবিষ্যতে, আর-এর পূর্ববর্তী ১২ বছর মিশে আছে ইতিহাসের পাতায়।

সমাপ্ত

'র'-এর সাংগঠনিক ছক

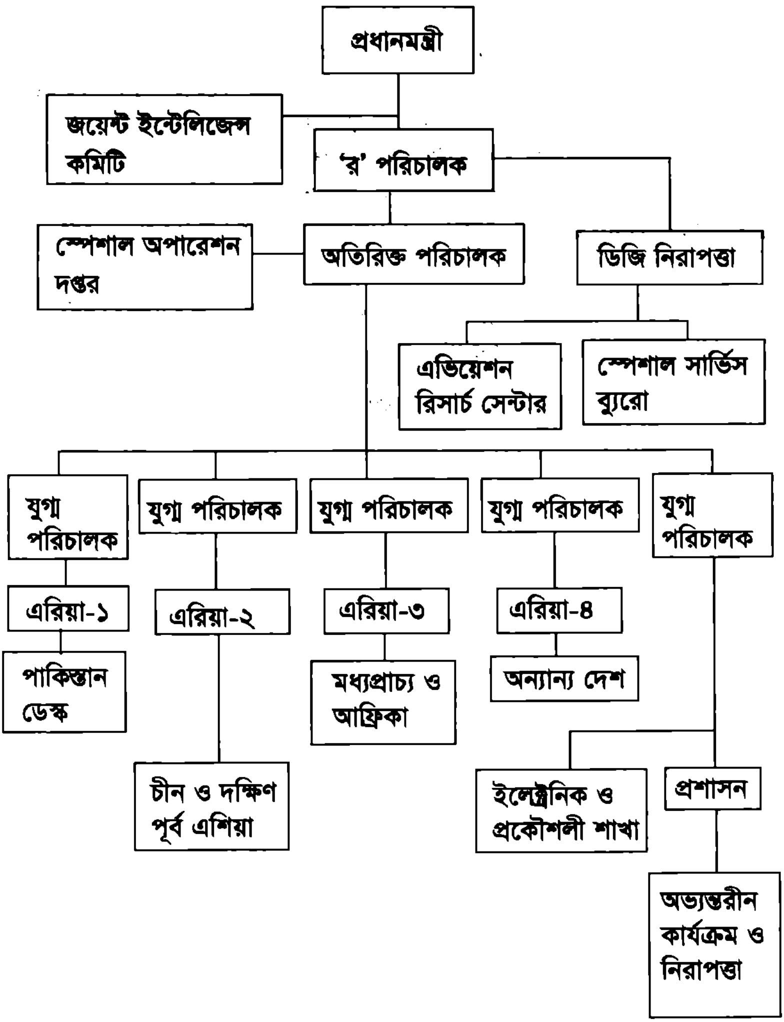
প্রধানমন্ত্রী
জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি
'র' পরিচালক
স্পেশাল অপারেশন দপ্তর
অতিরিক্ত পরিচালক
ডিজি নিরাপত্তা
এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার
স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো
যুগ্ম পরিচালক
যুগ্ম পরিচালক
যুগ্ম পরিচালক
যুগ্ম পরিচালক
যুগ্ম পরিচালক
এরিয়া-১
এরিয়া-২
এরিয়া-৩
এরিয়া-৪
পাকিস্তান ডেস্ক
মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা
অন্যান্য দেশ
চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
ইলেক্ট্রনিক ও প্রকৌশলী শাখা
প্রশাসন
অভ্যন্তরীন কার্যক্রম ও নিরাপত্তা

CURRENT ORGANISATIONAL STRUCTURE - RAW

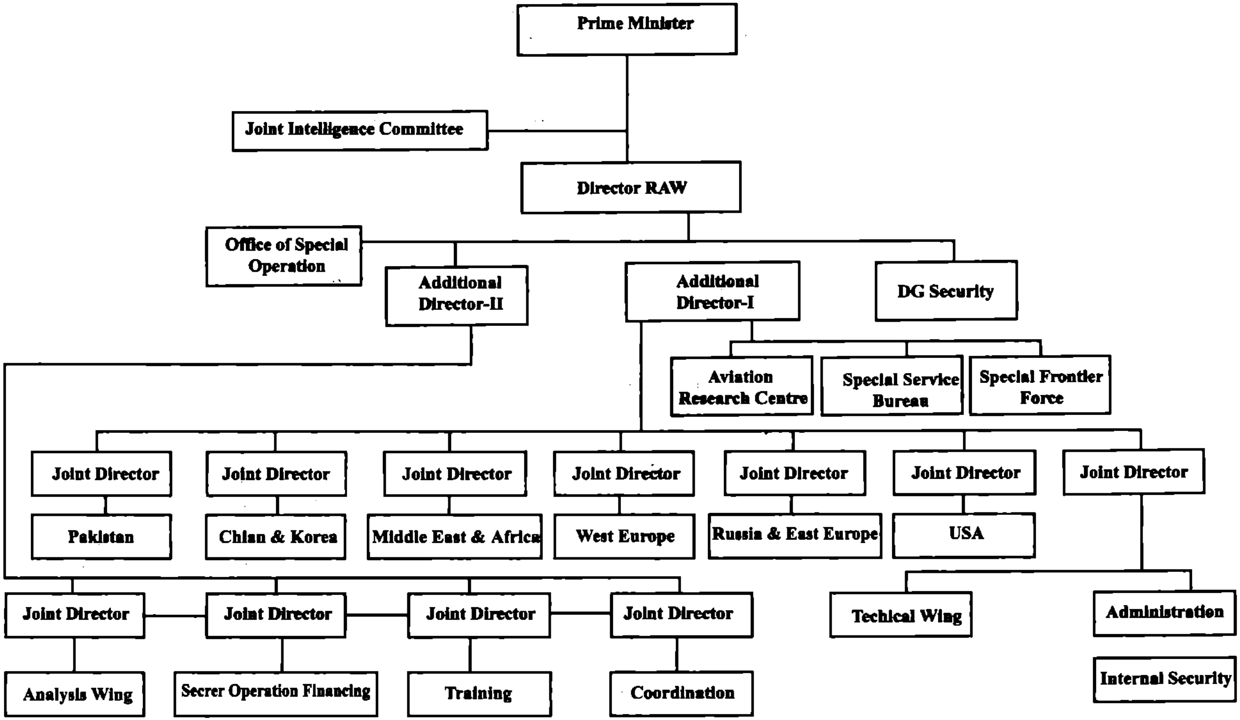

Source: Compiled from various Indian media reports.

NETWORK OF INTELLIGENCE AGENCIES

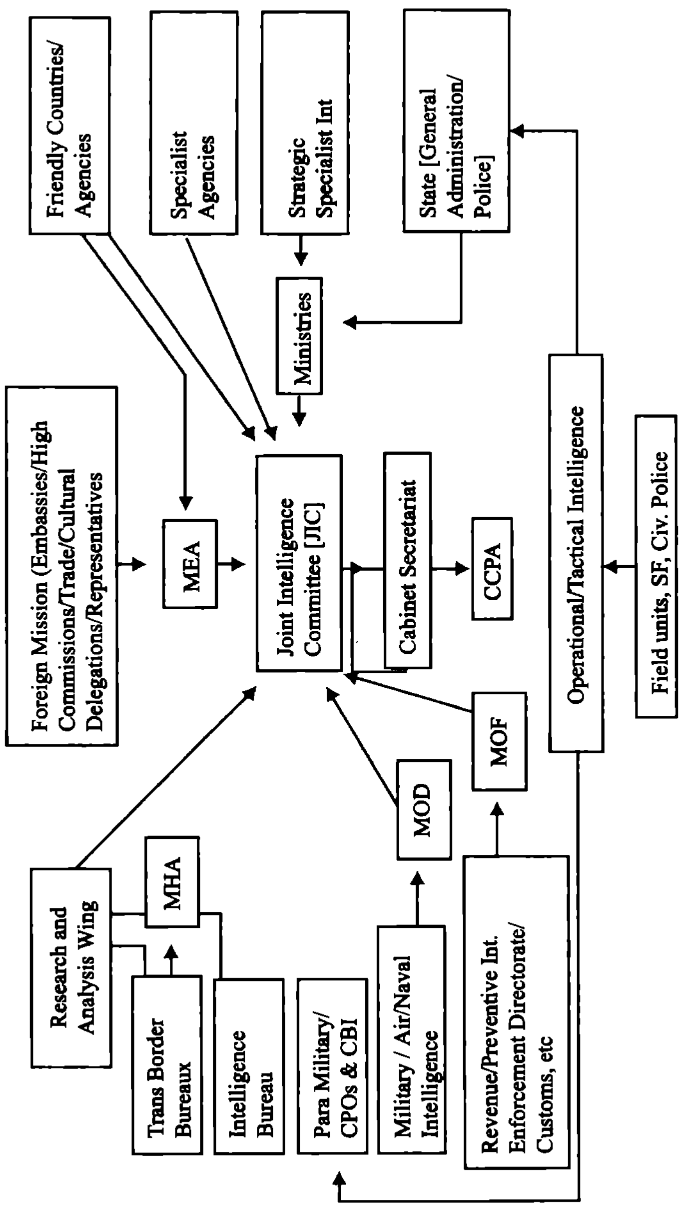

Source: *Indian Defence Yearbook*, Natraj Publishers, New Delhi, 2000.

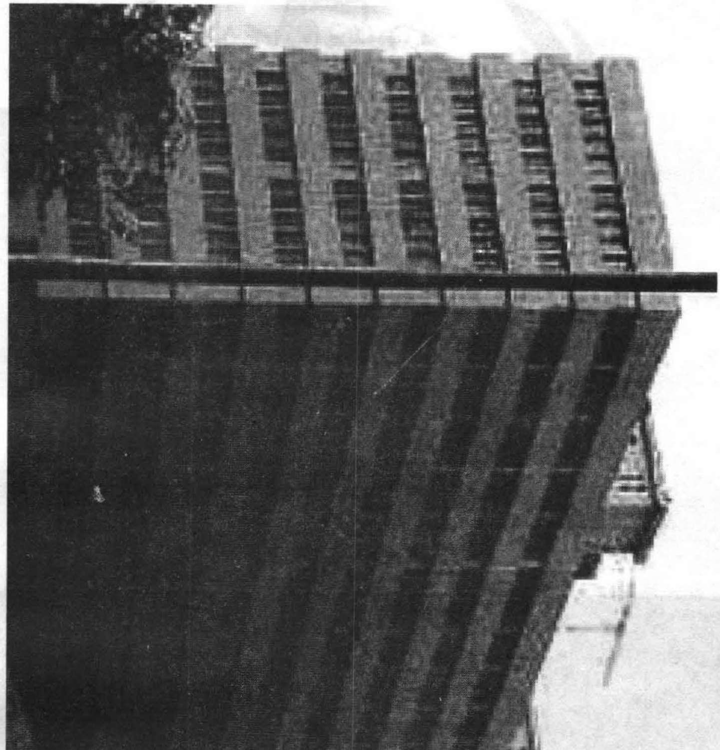

'র' সদর দপ্তর, বসন্ত বিহার, দিল্লি

'র'-এর লোগো

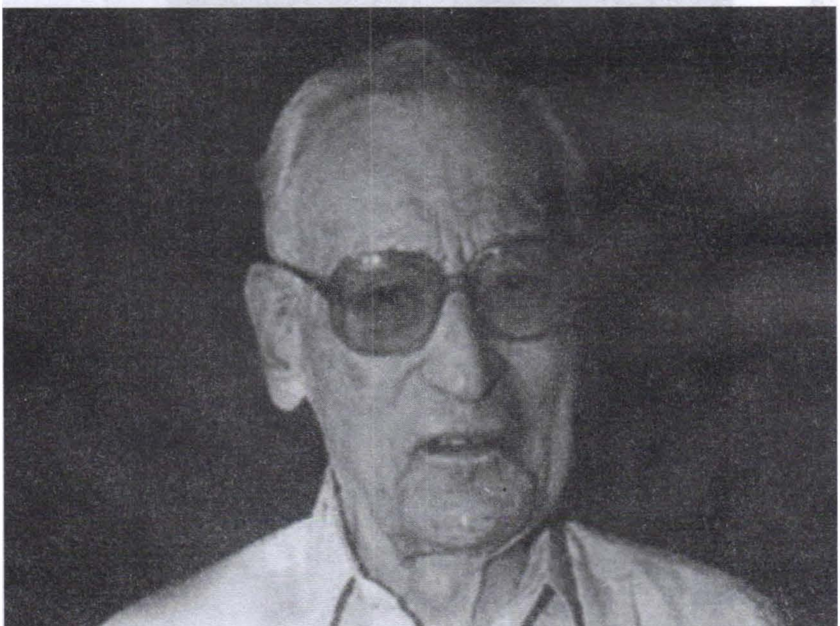

'র' -এর সাবেক প্রধান - প্রবাদপ্রতিম আর, এন, কাও

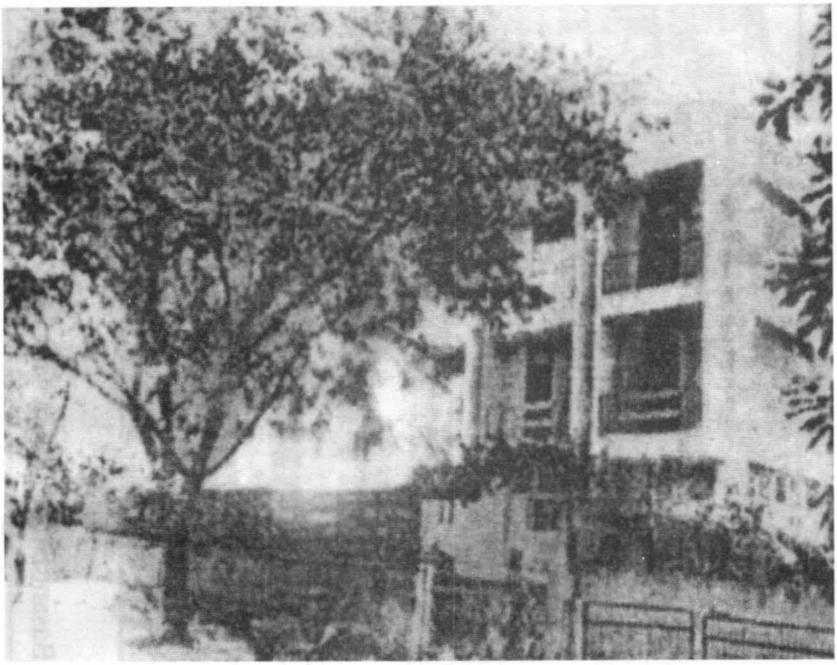

'র' -এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৯১৭-এ 'র' প্রশিক্ষক মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন

'র'-এর সাবেক কর্মকর্তা বিশেষ সচিব আর স্বামীনাথন

ইনসাইড 'র' তে উল্লেখিত কাদের সিদ্দিকী - মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে

১৯৭৪-এর মে'তে পোখরানে ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ

ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ ইন্দিরা গান্ধী পারমাণবিক বিস্ফোরণস্থল পোখরান পরিদর্শন করেন। তার সাথে দেখা যাচ্ছে কে সি পান্থ (বায়ে) ও এটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান এইচ, এন, সেথনাকে (ডানে)

সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভূক্তিকরণে সহায়তাকারী কাজী লেন্দুপ দোর্জি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে

সিকিমের শেষ স্বাধীন রাজা নামগয়াল তার মার্কিন স্ত্রী হোপ কুক ও রাজ পরিবারের সদস্যদের সাথে

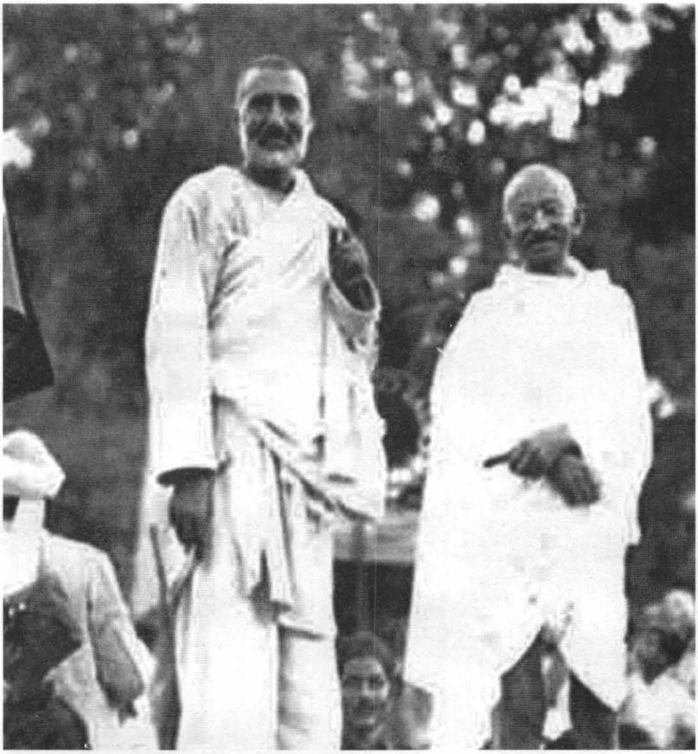

পাকিস্তানের পাখতুনিস্তান আন্দোলনের নায়ক খান আব্দুল গাফফার খান ভারতের গান্ধীর সাথে

রাজশাহীতে ধৃত কয়েকজন 'র' এজেন্ট

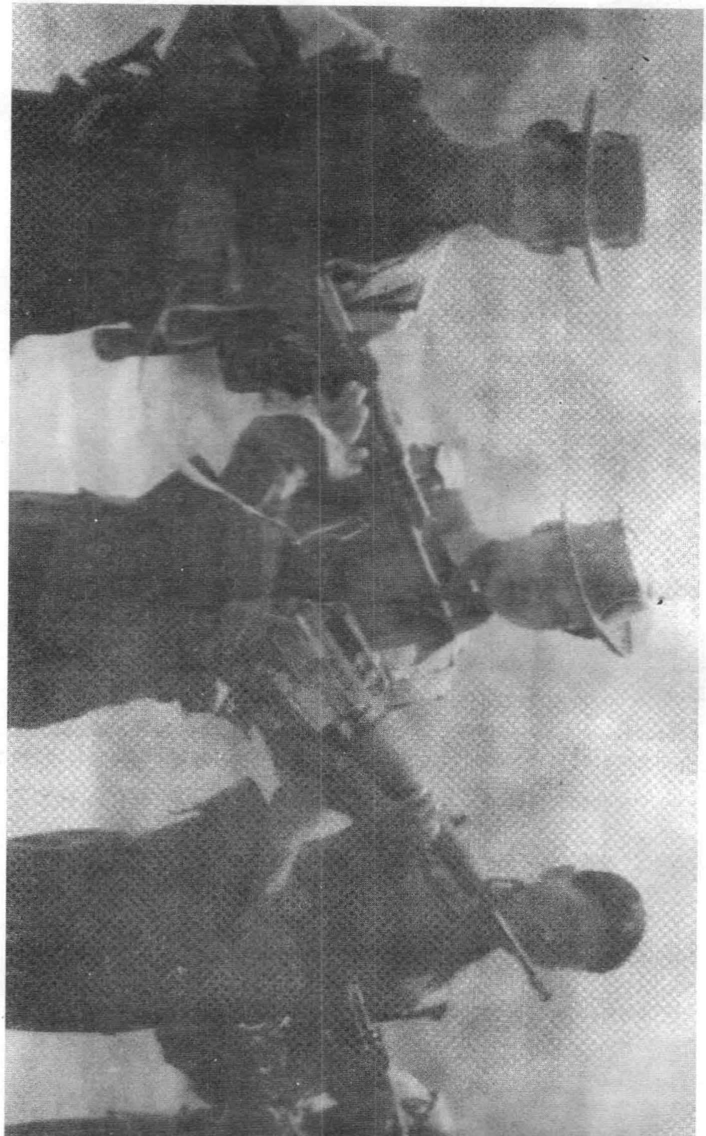

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর ক'জন সদস্য। 'র' শান্তি বাহিনী সংগঠিত করা, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে

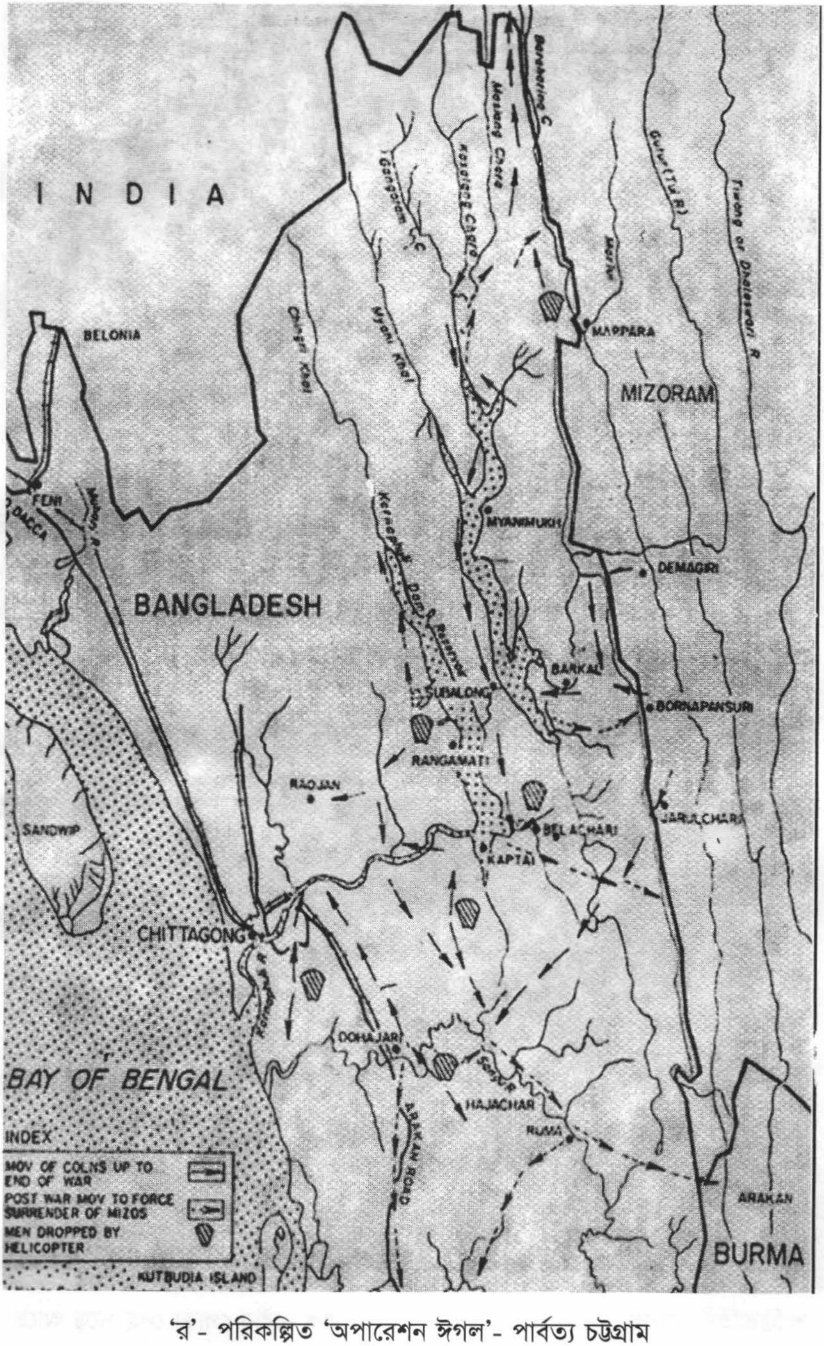

'র'- পরিকল্পিত 'অপারেশন ঈগল'- পার্বত্য চট্টগ্রাম

শান্তিবাহিনীর হাতে নিহত বাংলাভাষী শিশু

শান্তিবাহিনী বাঙ্গালীদের বসতবাড়ী পুড়িয়ে দিলে এক নারীর পোড়া দেহ পড়ে আছে

REPORT ON

CHAKMA BUDDHISTS REFUGEES IN INDIA & THEIR REPATRIATION

INDIAN BUDDHISTS CO-ORDINATION COMMITTEE
(Regd. under Societies Registration Act XXI of 1860)
भारतीय बौद्ध समन्वय समिति
Buddha Vihara, Mandir Marg, New Delhi-110001

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি 'র' প্রপাগাণ্ডা পরিচালনাতেও সহায়তা করে

ভারতের অভ্যন্তরে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ (সন্তু লারমা বসে আছেন ডানে)

ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুল ডাইরেন্ডিতে প্রশিক্ষণরত কয়েকজন শান্তিবাহিনীর সদস্য

MAP OF BANGABHUMI

Government of Bangabhumi
Samantanagar Muktibhaban
25 . 3 . 82

তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত বঙ্গভূমি'র ম্যাপ ও পতাকা

চাকমা শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা

একজন বিজেপি নেতা বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন-এর পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছেন। ধারণা করা হয় তসলিমার 'লজ্জা' বইটি 'র'-এর আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল

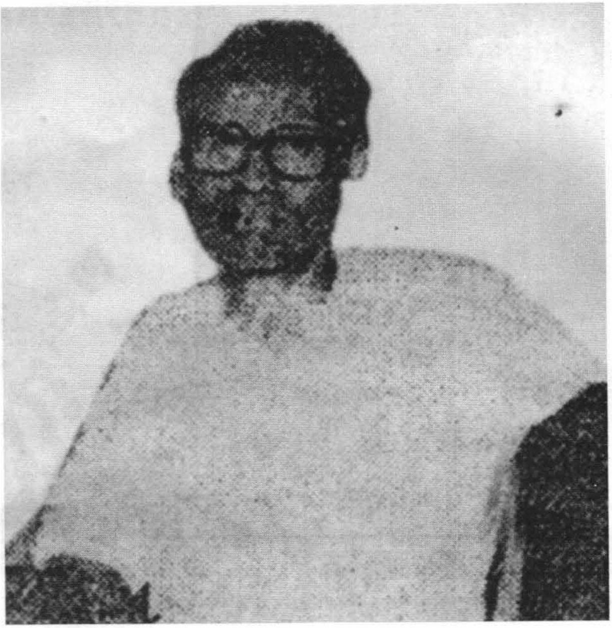

'স্বাধীন বঙ্গভূমি'
আন্দোলনের নেতা
কালীদাস বৈদ্য

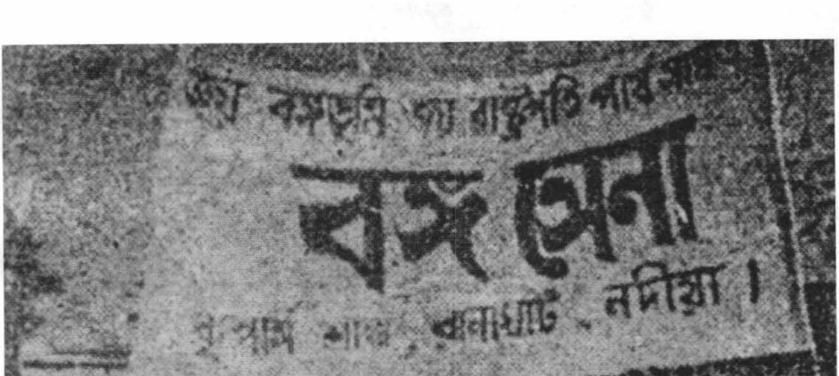

'বঙ্গসেনা'র বাংলাদেশ অভিমুখে মিছিল

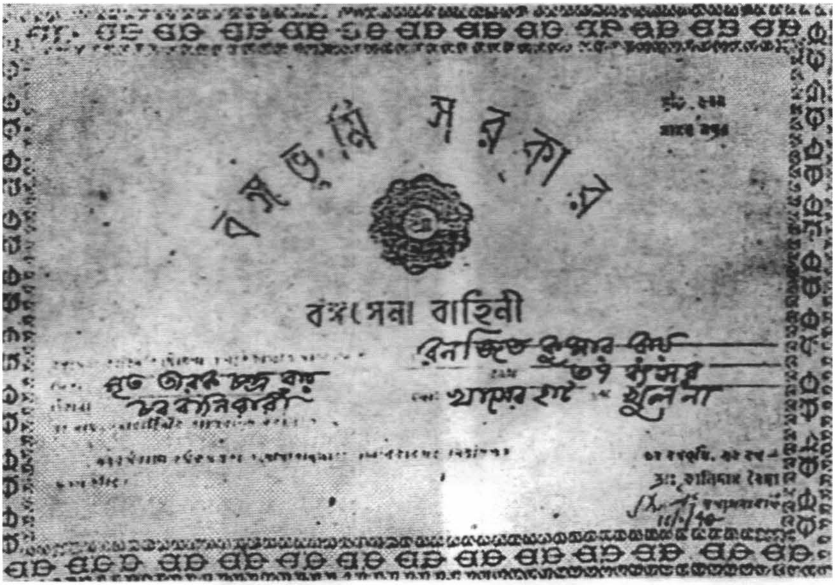

বঙ্গভূমি নেতা ডা. কালিদাস বৈদ্য স্বাক্ষরিত 'বঙ্গ সেনাবাহিনীর' পরিচয়পত্র

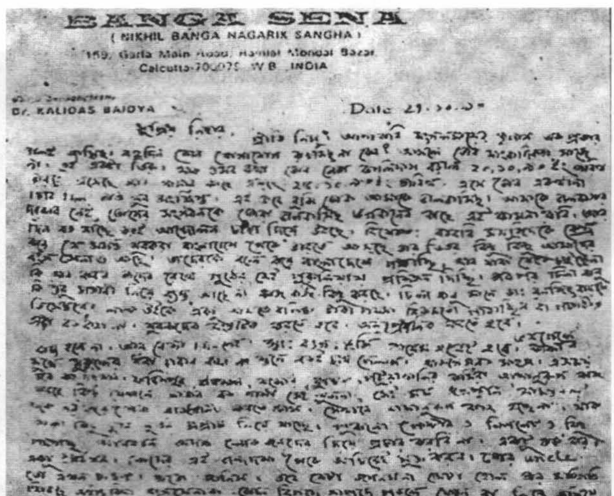

BANGA SENA
(NIKHIL BANGA NAGARIK SANGHA)
Calcutta-700075 W.B. INDIA
Dr. KALIDAS BAIDYA
Date 27.10.93

একজন কর্মীর কাছে লেখা ডা. কালিদাস বৈদ্য'র চিঠি, যা পাঠানো হয়েছিল ২৭-১০-৯৩ তারিখে

মোহাজির সংঘ ও বঙ্গভূমি আন্দোলনের অন্যতম পরিকল্পক সুশান্ত সাহা

তথাকথিত মোহাজির সংঘের প্রেসিডেন্ট রইসউদ্দিন ও তার রিকশা। এর বাড়ি যশোর হলেও তিনি কলকাতায় বসবাস করছেন

কলকাতার ভবানীপুরের 'সানি ভিলা'। এটি বঙ্গভূমি ও মোহাজির সংঘের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সুতিকাগার। বঙ্গভূমি নেতা চিত্তসুতার এ বাড়িতেই বসবাস করেন

সামরিক কর্মকর্তা থেকে সাংবাদিক। এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। আবু রুশ্‌দ একসময় ক্যারিয়ার হিসেবে সৈনিক জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে সেই পেশা থেকে নিয়ে এসেছেন সাংবাদিকতায়। আবু রুশ্‌দ-এর জন্ম ১৯৬৫ সালের ২০ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ জেলায়। তার পিতা ছিলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক। রংপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে এইচ এস সি পাশ করার পর অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেন ১৩তম দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে। ক্যাডেট কলেজে সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা ও ইংরেজী বিতর্কে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পরবর্তীতে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে দীর্ঘ দুই বছরের প্রশিক্ষণকালে ৩য় ও ৪র্থ টার্মে যথাক্রমে কর্পোরাল ও আন্ডার অফিসার এ্যাপয়েন্টমেন্ট লাভ করেন। ১৯৮৫ সালের ২০ ডিসেম্বর কমিশন পান কোর্সের প্রথম দশজনের একজন হিসেবে।

সিগন্যাল কোরের অফিসার হিসেবে বেসিক কোর্স ও স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রী এন্ড ট্যাকটিকস্‌-এ ওডব্লিউ কোর্স কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে স্বাস্থ্যগত কারণে অবসর দেয়া হয় ১৯৮৯ সালে। এল পি আর শেষে তদানীন্তন সরকার বেসামরিক পর্যায়ে সরকারি চাকুরি দেয়ার ব্যবস্থা করলেও তিনি তাতে যোগ দেননি। এরপর চলে আসেন সাংবাদিকতায়। এ পর্যন্ত সিনিয়র রিপোর্টার, বিশেষ সংবাদদাতা ও সহকারী সম্পাদক পদে কাজ করেছেন বেশক'টি প্রথম শ্রেণির দৈনিক পত্রিকায়। টেলিভিশন রিপোর্টিং-এর উপর কোর্স করেছেন ও তাতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা সাংবাদিকতার শুরু আবু রুশ্‌দ-এর হাত দিয়েই। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তি রক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর আমন্ত্রণে গিয়েছেন সিয়েরালিওন ও দক্ষিণ সুদানে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নেয়া ও মিডিয়া টিমের সদস্য হিসেবে ভ্রমণ করেছেন যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, চীন ও পাকিস্তান। এছাড়াও ঘুরে বেরিয়েছেন আরো বেশক'টি দেশ।

২০০৮ সাল থেকে নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করছেন বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিরক্ষা বিষয়ক জার্নাল 'বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল'। পাশাপাশি নিরাপত্তা বিশ্লেষক হিসেবে বিদেশের অনেক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পত্রিকা ও জার্নালে তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোর টক শো'তেও অংশগ্রহণ করছেন নিয়মিত।

তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে- 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিবাহিনী ও মানবাধিকার', 'ইনসাইড 'র'-ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায় (অনুবাদ)', 'বাংলাদেশে 'র': আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধানে', 'Secret Affidavit of Yahya Khan on 1971', এবং 'জাতীয় নিরাপত্তা, রণনীতি ও সশস্ত্র বাহিনী'। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে তার অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

'Inside RAW: The Story Of India's Secret Service'-ভারতীয় সাংবাদিক অশোকা রায়নার লেখা একটি সাড়া জাগানো বই। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা নিয়ে এটিই প্রথম দালিলিক উপস্থাপন। এতে রয়েছে 'র'-এর সাংগঠনিক অবয়ব, এর কর্মপদ্ধতি, গোপন কলা কৌশল সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত ও ঘটনার বিবরণ। তবে সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিষয় হচ্ছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র'-এর ভূমিকা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীকে সহায়তা দান ও সিকিমের ভারতভুক্তকরণ নিয়ে চমকপ্রদ গোপন তথ্য। অশোকা রায়না তার দেশ-ভারতের স্বার্থকে সামনে রেখেই বইটি লিখেছেন। তবে বাংলাদেশের ইতিহাস সচেতন পাঠক ও গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে তাদের জন্য এই বইটি অবশ্য পাঠ্য। ইনসাইড 'র' : ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায় অশোকা রায়নার মূল বইটির অনুবাদ। চলতি চতুর্থ সংস্কারণে ভাষাগত সম্পাদনা ছাড়াও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ছক ও ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে।

Bangladesh DEFENCE Journal Publishing

বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল পাবলিশিং

ISBN : 978-984-90730-1-7

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা